মন এক উষ্ণ প্রস্রবণ



মনন দাস

মন এক উষ্ণ প্রস্রবণ

মনন দাস

সৌরভ
গ্রন্থ প্রকাশ
বালী, হাওড়া

Mon ek usna prosrobon
A novel by
Manan Das

প্রকাশকঃ
বউল পাঁজা
৫৭/২, গঙ্গাকান্ত ভাদুড়ী স্ট্রীট,
বালী, হাওড়া, ৭১১২০১

মুদ্রকঃ বউল পাঁজা

প্রচ্ছদঃ ফটিক দাস

প্রথম প্রকাশ – ঝুলন পূর্ণিমা ১৩৯৪
দ্বিতীয় সংস্করণ – কোলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা ১৪৩১ (ইং ২০২৫)

মূল্যঃ দেড়শ টাকা

উপহার

কবি বন্ধু শান্ত রায় ও মাধবী রায়

যুগলকে

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থঃ

উপন্যাসঃ

মনভূমি
ঝলমলি
ছুট
গোবু গোবিন্দ

গল্প সংগ্রহঃ

অন্য স্বাদ
পঞ্চশ্বর
গল্প পঞ্চক
জীবন যাপন
গ্রাস

কিশোর উপন্যাসঃ

রাজু নারাণের কীর্তি

ছড়ায় গল্পঃ

আটটা ঠাট্টা

কবিতাঃ

বন সবুজের মন (কবিতা সংগ্রহ, ১ম পর্ব)
স্থাবর অস্থাবর (কবিতা সংগ্রহ, ২য় পর্ব)

গানের বইঃ

গান আমার, কিছু কথা কিছু সুর, কিছু অনুভব

এক

দুঃখ পাখি, ডানার ভাঁজে মুখ ডুবিয়ে নিঝুম বসে দিন রাত্তির, খাঁচার দরজা খোলা আছে, উড়ে তুমি যাওনা কেন? নাকি এমন দুখের রাজ্যে বড় আশায় ঘর বেঁধেছ, থাকতে চাইছ পাকাপাকি সারা জীবন? নাকি তুমি জয় করে এই দুঃখ ভূমি নাম দিয়েছ দুঃখ নগর, গড়েছ এক ধূসর প্রাসাদ দুঃখপুরী ডানার মাঝে মুখ ডুবিয়ে সেথায় বসে দিনরাত্তির, বুকের দরজা খোলা আছে, উড়ে তুমি যাওনা কেন!...

সকাল থেকে এইসব শব্দ, কথা তার বুকের মধ্যে উসখুস করছিল। মানসিক যন্ত্রণা ও দুশ্চিন্তায় অস্থির কয়েকটি রাত্রি যাপনের পর গত রাত্রি সে অতিবাহিত করেছে গভীর এক নিশ্চিত ঘুমের মধ্যে। সকালে ঘুম ভেঙে যখন এক প্রশান্ত অনুভব বুকের মধ্যে - অথচ পাশাপাশি কেমন এক বিষন্ন স্রোত এভাবে দুঃখ সুখের মেশামিশি স্রোতে ভাসমান সে নিশ্চুপ শুয়েছিল অনেকক্ষণ, তখন একটি পাখি বুঝি নড়াচড়া করছিল তার বুকের মধ্যে। সে কি দুঃখ পাখি?

সেই ঘুম ভাঙা থেকে আর এখন অফিসে আসা পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় একই ভাবে যে বুকের মধ্যে উসখুস করছে! আধো অন্ধকার তার অফিস চেম্বারে সে এখন দাঁড়িয়ে। এ ঘর - এই ঘরের বাতাসে ছড়িয়ে আছে অনুপস্থিত এক মানুষের নিজস্ব সুগন্ধ.... এই ঘরের চার দেওয়ালে নিশ্চুপ মিশে আছে কত কথোপকথন.... কত অভিব্যক্তি আয়নার মতো প্রতিফলিত প্রতিটি কোনে কোনে.... এসব তাকে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ঘিরে ধরে, আলিঙ্গনে আবদ্ধ করতে চায়। নিঝুম দাঁড়িয়ে সে অনুভব করে সুখ। মনের মধ্যে এলোমেলো শব্দেরা শৃঙ্খলতায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কবিতার জন্ম দেয়....দুঃখ পাখি.... ডানার মাঝে মুখ ডুবিয়ে নিঝুম...

টেবিলের ওপর হঠাৎ টেলিফোনের ঝনাৎকার, সে সচকিত। অন্ধকার ঘরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকায় আধো আধো দেখা যাচ্ছিল আসবাব, সে টেবিলের পাশে এগিয়ে গেল। বুকের মধ্যে দ্রুতগামী রক্তস্রোত - তাহলে কি

নার্সিংহোম থেকে ফোন এলো? কোনো দুঃসংবাদ? কিন্তু আমিতো তাকে সুস্থ - ভাবতে ভাবতে টেবিলের ওপর পাশাপাশি দুটি টেলিফোনের একটা তুলে নিল সে। কিন্তু না, অন্য টেলিফোনটা তখনও বেজে চলেছে। - আহ্ তাহলে বাইরের ফোন নয় - ভাবল সে, একটা স্বস্তির ভাব ছড়িয়ে পড়ল মনে, ও টেলিফোনটা অফিসের ভেতরের যোগাযোগ, এটা নামিয়ে অন্য রিসিভারটা তুলে নিল।

- হ্যালো, মিত্র বলছি।

- অ! তুমি তাহলে অফিসে এসেছ! তিনদিন ধরে রোজই তোমাকে ফোন করছি।

- গুড মর্নিং স্যার, হ্যাঁ কদিন আমি একটা বিশেষ কাজে আটকে পড়েছিলাম-

- যার জন্য ফোনেও একটা সংবাদ দিতে পারোনি। তুমি জানো, দিল্লিতে যে বিরাট শিল্পমেলা হবে সেখানে আমাদের প্যাভিলিয়ন হবে, সে সংক্রান্ত আলোচনার জরুরী মিটিং - যেটা তোমার অনুপস্থিতিতে বাতিল করতে হয়েছে - এটা এক নম্বর, দুই, তুমি কয়েকজন শিল্পীকে প্যাভিলিয়ানের মডেল তৈরী করে আনতে দিয়েছিলে, তিনটি মডেল এসে পড়ে আছে, ওর মধ্যে একটা পছন্দ করে তৈরি করার ব্যবস্থা - সময় খুব কম, কিন্তু সেটাও হয়নি। তিন - দিল্লী বম্বে ও মাদ্রাজের সংবাদপত্রে শিল্পমেলা এবং আমাদের কোম্পানি এ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন - সেই বিজ্ঞাপনে আমাদের প্যাভিলিয়নের মডেলের ছবি - এটার ব্যবস্থা করার কথা, যেটা এক্ষুনি করা দরকার, সেটাও কিছু হয়নি। এই রকম সব জরুরী ব্যাপারগুলো নিয়ে গতকাল ডাইরেকটর বোর্ডে-এ আমাকে খুবই সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছে।অবশ্য তোমাকে নিয়েই বেশি সমালোচনা। কারন তাঁরা সকলেই জানেন সমস্ত কাজগুলোই পাবলিসিটির এক্তিয়ারে। কিন্তু যেহেতু তুমি অনুপস্থিত সেজন্য তোমার বস্ হিসেবে আমাকেই আক্রমণ করা হয়েছিল, আর আমি তোমাকে খুবই দায়িত্বশীল বলে জানি, সেজন্য কখনোই তোমার কাজে নাক গলাই না। আমি জানি তোমার কাজ তুমি ভালই জানো।

কিন্তু তুমি হঠাৎ এমন দায়ীত্বহীন কাজ করবে এটা কি ব্যাপার?

....সীমান্তে অবিচ্ছিন্ন গোলাবর্ষণের শব্দ... বাঁচবার জন্য কোথাও কি কোনে দেওয়াল নেই?... না কি ভেঙে তছনছ সব বর্ম ও ব্যারিকেড... মাটির ভেতর নেমে যাওয়ার মতো সুড়ঙ্গ কোথায়!

- আমি দুঃখিত স্যার - বিপর্যস্ত সে বলল - কদিন আমি মনের দিক থেকে এমনই এলোমেলো ছিলাম যে অন্য কিছু ভাবতে পারিনি। অবশ্যই ভাবা উচিত ছিল, আমি খুবই দুঃখিত। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব সব কিছু আমি - (আঃ কি লাঞ্ছনা! দিনে দিনে আমি কিভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছি)

- কিন্তু তোমার এই ভীষণ জরুরী ব্যস্ততা আর মানসিক এলোমেলো ব্যাপারের রহস্য আমি জানি। শুধু আমি কেন, এতবড় অফিস বাড়িটার সব বিভাগের প্রত্যেকে জেনে গেছে যে ছাব্বিশে ডিসেম্বর ভোরবেলা তুমি তোমার সেক্রেটারিকে অজ্ঞান অবস্থায় ট্যাক্সি করে নার্সিংহোম এ নিয়ে গিয়েছ। তারপর অবশ্য এই তিন দিন ধরে তুমি কি করেছ তুমিই জানো। কি সব জঘন্য ব্যাপার! এর জন্য তোমার বিরুদ্ধে - (একটা বিরক্তিসূচক শব্দ) তুমি আমার কাছে মুখোমুখি জবাবদিহি করবে। না এখন নয়, পাঁচটার পর। এরকম একটা স্ক্যাণ্ডাল তুমি করবে এটা আমি ভাবতেও পারিনি - না, তা কেন, আমার ভাবা উচিত ছিল, তোমার পক্ষেই তো করা সম্ভব, যারা বাইরে বেশি বেশি অনীহা দেখায় তারাই তো -

টেলিফোন জোরে রেখে দেওয়ার শব্দ।

....সীজ্ ফায়ার... শেষ গুলি ব্রহ্মতালু ভেদ করে চলে গেছে....এখন শুধু ধোঁয়া আর বারুদের গন্ধে ভারী একান্ত বাতাস....আর কোনো শব্দ নেই, আর কোনো যন্ত্রণাও নেই, শুধু ভীষণ শীতল এক স্রোত তাকে ঘিরে ময়াল সাপের মতন... গরম পোষাকের মধ্যেও কেঁপে ওঠে শরীর। আস্তে রিসিভার নামিয়ে রাখল সে। তার মনে হলো এই বিশাল অপিস বাড়িটার সমস্ত লোকজন এতক্ষণে জেনে গেছে আজ আমি তিনদিন পর অফিসে এসেছি, এখন তারা দলবেঁধে এগিয়ে আসছে আমার চেম্বারের দিকে। এখনই দরজা হাট করে খুলে ওরা ঢুকে

পড়বে।আঙুল তুলে হো হো করে বিদ্রুপের হাসি হাসবে। আবারও কেঁপে উঠল সে। অন্ধকার ঘরের এদিক ওদিক তাকাল। ভারী পর্দাগুলো সরিয়ে দিলে এখনই এ ঘর আলোয় ভরে যাবে। পূবের দেওয়ালটা পুরোটাই প্রায় কাচের। ওদিকে পর্দা সরালে ঝাঁপিয়ে পড়বে রোদ্দুর। - না না, আমি আলো চাইনা, আমি এখন অন্ধকারেই থাকতে চাই। না কি আমি এখন এখান থেকে চুপিচুপি পালিয়ে যাবো? কিন্তু এখন এ ঘর থেকে বেরোলে সামনে হলঘর লোকজনে ভরে গেছে। সকলেই অফিসে এসে গেছে। আমি এখন তাদের মাঝ দিয়ে কেমন করে হেঁটে যাবো?

দরজার হাতল ঘোরানোর শব্দ, সে কেঁপে উঠল - ওই ওরা এসে গেছে - ভাবল সে, দু'হাতে মুখ ঢাকল।

বিশেষ কোনো শব্দ নেই, সম্ভবতঃ একজন কেউ ঘরে ঢুকে ওদিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মুখ থেকে হাত সরালো সে - পূবের দেওয়ালের পর্দা সরিয়ে দিচ্ছে বেয়ারা। ঘরের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল রোদ্দুর, মেঝের ওপর লুটোপুটি দিয়ে খানিকটা বেঁকে ত্রিকোন আকারে ঝুলে রইল ক্যাবিনেটের কোনায়।

- আপনি স্যার কদিন আসছিলেন না - বেয়ারা বলল - আমি তাই আজকে আর ঘর খুলিনি - বলতে বলতে বেয়ারা টেবিল চেয়ার একটু ঝাড় মোছ করছিল। টেবিল ক্যালেন্ডারের তারিখ বদলালো - উনত্রিশ ডিসেম্বর। প্রস্তর মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে দেখল সে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বুঝতে চাইল বেয়ারার মুখের অভিব্যক্তি। বেয়ারা বেরিয়ে গেল।

একই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একটা দারুণ রাগ তার মনের মধ্যে ঝড়ের মতো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল -তুমি নোংরা বুড়ো বদমাস, তোমাকে আমি চিনি না? - মনে মনে রাগে গরগর করে উঠল সে - তুমি কি না আমাকে ধিক্কার দিচ্ছ, আমাকে ধমকাচ্ছ, জঘন্য কাজ করেছি বলছ! তুমি একটা এক নম্বরের চরিত্রহীন, তোমার কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে? কেন? কি করেছি আমি যে তোমার মতো একজন দুশ্চরিত্রের কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে? তুমি একটা শয়তান, তুমিই আমাকে লেডী সেক্রেটারী নেওয়ার

জন্য বাধ্য করেছিলে। বাজে রসিকতা করে হাসির ছলে নোংরা ইঙ্গিত করতেও বাধেনি। আমি তোমাকে চিনি।বাইরে তুমি খুব খোলামেলা হাসিখুশি উদার মানুষ, আর সেভাবেই নিজের চরিত্রটা আড়াল করো, কিন্তু আমি তোমাকে চিনি। আমি তোমার কাছে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে জবাবদিহি করতে রাজি নই। মনে মনে সে প্রতিপক্ষকে নিজের সামনে দাঁড় করিয়ে রাগে খানখান হয়ে ভেঙে যাচ্ছিল - শুনছেন মশাই, এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, এ ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে কোনো কথা বলতে বাধ্য নই - ধমকের মতো কথাগুলি মুখফুটে বলে ফেলল সে এবং চমকে উঠল। ঘরের এদিক ওদিক দেখল সে, এদিক থেকে ওদিক দুবার পায়চারি করল, টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল, মেঝেতে পা ঠুকল, টেবিলে ঘুষি মারল - শুনছেন মশাই - মনে ধমকাল সে - আপনি, হ্যাঁ আপনি, আপনিই এই বিষবৃক্ষের বীজ পুঁতেছিলেন, আমি সেদিন প্রতিবাদ করেছিলাম কিন্তু আপনি আমাকে বাধ্য করেছিলেন। সেই বিষবৃক্ষ আজকে আমাকে বিষফল খাইয়ে এরকম কলঙ্কের মুখোমুখি - আঃ- না না - সে আক্ষেপে কাতরোক্তি করে উঠল, দুহাতে মুখ ঢেকে মাথা নাড়ল - না না বিষফল নয়, জীবনে কিছু অমৃতের স্বাদ - ফিসফিস করে বলল সে, আর শান্ত হয়ে গেল।

বুকের ভেতর কোথায় যেন এক স্রোতস্বিনী পাহাড়ের পাথরে পাথরে ছুটছে, সুখের শব্দ বাজছে ঝুমঝুম! ঝুমঝুম! সকালের সেই ঘুম ভাঙা পাখি গান গাইছে, সে গানের সুর ও নদীর কলতান মিলেমিশে একাকার...

ধীর পায়ে জানালার দিকে এগিয়ে গেল সে, জানালায় শরীরের ভার রেখে বাইরে তাকালো।

বিশাল এই বড়ীটার সামনে রাস্তা, রাস্তার ওপারে দুতলা তিনতলার বেশি উঁচু বাড়ি নেই। সুতরাং এই নবম তলে দাঁড়িয়ে তার সামনে ডিসেম্বরের রৌদ্রজ্জ্বল নীল আকাশ। সে আকাশ দেখল, গায়ে পড়া রোদ্দুর দেখল, আবার আকাশ, তারপর বিশাল কলকাতার অসংখ্য বাড়ি - তার মুখে শান্ত এক হাসির আভাস।

যত দূর দেখা যায় শুধু বাড়ি আর বাড়ি, যেন সব পিসবোর্ডের খেলনা থরে

থরে সাজানো - ভাবল সে - এই পৃথিবীতে শুধু নিজেকে নিয়েই কত ছড়িয়ে আছি! আমার কাজ - তুচ্ছাতিতুচ্ছ থেকে শুরু করে জটিলতম কাজগুলি - যার প্রত্যেকটিতে জড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য ভাবনা চিন্তা, সেগুলোকে সুষ্ঠুভাবে করে ফেলার জন্য আমার ব্যস্ততা, বা আমার প্রতিটি চিন্তাধারাকে রূপ দেওয়ার জন্য জড়িয়ে রয়েছে কত মানুষ! শুধুমাত্র আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজনগুলির জন্য আমার প্রতিটি পদক্ষেপে আরেকজন মানুষের সাহায্য - এইভাবে আমিই পৃথিবী জুড়ে বিস্তারিত! আমার বুক দুঃখে ভারী হতে হতে যখন বিশাল হয়ে যায় তখন দুঃখে ঢাকা পড়ে যায় সমস্ত পৃথিবী। আমার সুখ যখন উচ্ছল হয়ে ওঠে তখন কি আশ্চর্য মায়ায় ভরে যায় বিশাল পৃথিবীর আকাশ বাতাস! - সে আবার শান্ত হাসল, আঙুল দিয়ে জানলার কাচে আঁকিবুকি কাটল।

আমার প্রতিটি পদক্ষেপে এক একটি মানুষের হাত। আবার এইসব প্রত্যেকটি মানুষের আমারই মতো এক একটি পৃথিবী। এই বিশল শহর - ভাবতে ভাবতে সে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলো রৌদ্রস্নাত শহরের ওপর - এই অজস্র খেলনার মতো থরে থরে সাজানো বাড়িগুলি - আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় কি নিঝুম এক শূন্যপুরী। কেউ কোথাও নেই.... মানুষের চেয়ে বরং দৃশ্যমান দুএকটি কাক যারা প্রাণের চিহ্ন নিয়ে আকাশে উড়ছে। অথচ এই অজস্র খেলনার মধ্যে লুকিয়ে আছে অজস্র মানুষ তাদের এক একটি বিশাল পৃথিবী নিয়ে - কি আশ্চর্য লাগে ভাবতে! সে আবারও শান্ত হাসল।

পৃথিবীর দূর দূরতম প্রান্তে সাহারার মরুভূমি কিংবা আফ্রিকার জঙ্গলে বেদুইন কিংবা বন্যমানুষ অথবা মেরুদেশে কোনো এস্কিমো, আমার নিজের এই বিস্তৃত পৃথিবীর এলাকার ছোঁয়াও তাদের কারো কাছে নেই, কিংবা আমাকেও এসে ছোঁয় না তাদের কারো পৃথিবীর এলাকার স্পন্দন। ভাবতে গেলে অবাক হতে হয়!... আবার অন্য কোনো গ্রহ হতে কেউ যদি দেখে এই পৃথিবীকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রে তার কাছে এই বিশাল মানুষের দল শুধু মাত্র প্রাণের অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছু নয়।... এসব কথা এলোমেলো ভাবতে ভাবতে একরাশ হাসি হাসল সে। টেবিলে ফোন বেজে উঠল - চমকে উঠল সে - নার্সিংহোম

থেকে কি - না, অফিসের ভেতরের কেউ - ফোন তুলল - মিত্র বলছি।

- আরে আরে কি ব্যাপার? আমি তোমার হিরন্ময় বলছি। তুমি তো উত্তাল ঢেউ ছড়িয়ে দিয়েছ হে! কিন্তু এটা কিকরে ঘটল? মেয়েদের নামে তোমার এলার্জি, সেই তুমি ভেতরে ভেতরে এত? বাহবা ভাই বাহবা! আমি অবশ্য জানি তোমার মানসিক গতি প্রকৃতি। যতই মুখে মুখে অনীহা দেখাও কিন্তু আগুন কি ছাই চাপা দিয়ে রাখা যায়? কতকাল রাখবে? এখন যে সব অগ্নিকান্ড!

....ভেঙে যায় আনন্দের পসরা... একটি একটি করে সাজিয়ে তোলা সুন্দর পুতুলগুলি রূঢ় হাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয় কেউ....ভেঙে তছনছ...

- খুব খুসি মনে হচ্ছে? - দাঁতে দাঁত চেপে বলল সে।

- তোমার দেখছি সেই রাগী রাগী ভাবটা এখনো যায়নি। কিন্তু এর মধ্যে রাগের কি আছে বলো? - হিরন্ময় উচ্ছসিত - তুমি তো একজন সুস্থ সবল যুবক, না কি? তবে জানাজানি হবার জন্য তোমার রাগ করার অধিকার অবশ্যই আছে। কিন্তু সেজন্য তুমি নিজেই দায়ী। তুমি কি না বোকার মতো সেই নার্সিংহোমেই ওকে তুললে যেটা আমাদের কোম্পানি অফিসারদের জন্য ব্যবস্থা করে রেখেছে। তোমার কি মতিভ্রম হয়েছিল? কলকাতায় আর নার্সিংহোম ছিলনা? নাকি এতই বেঘোরে ছিলে যে ওসব খেয়াল ছিল না? পঁচিশে ডিসেম্বর সকাল থেকেই শুরু করেছিলে না কি? ছুটির দিন সকাল থেকে একেবারে সারারাত! তা কি এমন কান্ডখানা করলে যে ফিয়াঁসেকে একেবারে নার্সিংহোম এ নিয়ে যেতে হলো?

- তুমি কি তোমার ঘরে একা আছ হিরন্ময়? না কি আরও অনেককে ডেকে একেবারে দলবদ্ধ ভাবে মজা করছ?

- হাঃ হাঃ ! না না, আমি একাই আছি, হাজার হোক আমি তোমার বন্ধু!

সে সজোরে রিসিভার রেখে দিলো। অস্থিরতা তাকে ছিন্নভিন্ন করছিল। সে অসহায় ভাবে হাত মুঠো করল।

দুই

নিঃশব্দে কোথায় কখন পড়ে বীজ,অঙ্কুরিত হয়, বেড়ে ওঠে পাতায় শাখায়...তারপর একদিন কুঁড়ি - কুঁড়ি থেকে ফুল - পরাগ সংযোগ - ফল ধরে শাখায় শাখায়...যদি তা বিষফল হয় দেবে হলাহল, দেবে যন্ত্রণা - মৃত্যু। আর যদি তা অমৃতফল হয় তাহলে জীবনে অনন্ত আনন্দ আর সুখ...

বিষ না কি অমৃত এ বৃক্ষের বীজ যেদিন রোপন করা হয়েছিল পুরোনো সে দিনের কথা...

তিনি বলেছিলেন - নীলু, ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় আমাদের একটা বিজ্ঞাপন দিতে হবে। চাকরির বিজ্ঞাপন। এখনই আলোচনা করে ঠিক করে ফেলা যাক। এজন্যই তোমাকে ডাকলাম। গতকাল আমাদের ডাইরেকটর বোর্ড মিটিং এ ব্যাপারটা ঠিক করা হয়েছে।

সে মনে মনে - নীলু কি মশায়? আপনার এই অন্তরঙ্গ ডাক আমার মোটেই ভাল লাগে না। আপনি এই দেশব্যাপী বিরাট কোম্পানির একজন ডাইরেকটর। আপনি বিশাল মানুষ। আপনার জুতোর ডগা থেকে টাইয়ের বাঁধন পর্যন্ত পুরোপুরি সাহেব। আপনার সাহেবের মতো ব্যবহার করাই ভাল নয় কি? হঠাৎ হঠাৎ আপনি আমাকে এরকম অন্তরঙ্গ ভাবে ডাকেন কেন? নীলু! না মশায়, আমি নীলাংশু মিত্র, আমি আপনাদের এই সংস্থার পাবলিসিটি ও পাবলিক রিলেশন অফিসার, আমাকে মিস্টার মিত্র বললেই আমি স্বস্তিবোধ করতে পারি। অবশ্য আপনি মিস্টার অনন্ত সান্যাল মহাশয় - আমার পিতৃ বন্ধু। কিন্তু তাতে কি? আমি কি ছোটবেলা থেকে আপনার হাত ধরে কাকা কিংবা জ্যাঠা বলে বড়ো হয়েছি? আমার মশায় এসব ভাল লাগে না। আপনি আমার সঙ্গে অফিসিয়াল ব্যবহার করবেন। এই যে আপনি এখন ফোনে পার্সোনেল অফিসারের সঙ্গে কথা বলছেন, কি ভাবে বলছেন? আমার সঙ্গেও ওভাবেই কথা বলা ভাল। - এত কথা সে মনে মনে বলে ফেলল।

সামনে দাঁড়িয়ে ওনার সেক্রেটারি মিসেস্ ডিক্রুজ, সে একবার আড়চোখে সেদিকে তাকাল, একবার মিস্টার সান্যালের দিকে। তারপর আবার মনে মনে –

- বিশেষতঃ কারো সামনে এইভাবে ডাকা খুবই খারাপ লাগে।হ্যাঁ, আমার অস্বস্তি লাগে। আপনি বুঝতে পারেন না কেন? এভাবে বিরক্ত হতে হতে একদিন আমি মুখের ওপর বলে দেবো, সেদিন –

আঃ, মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল । আজ ঘুম ভেঙে খারাপ সকাল শুরু হয়েছে। তখন থেকেই মাথা ধরে আছে। সকাল থেকে কেন, গতকাল রাত থেকেই মাথা ধরেছে, আর সাররাতেও ছাড়েনি। আসলে রাতে ভাল ঘুমই হয়নি। শরীর জোড়া বিশ্রী অবসাদ। এর জন্য দায়ী হিরন্ময়। সে গতকাল রাত্রে আমার ভেতর ক্ষুধিত শ্বাপদটাকে খুঁচিয়ে জাগিয়েছে। সেই নগ্ন লাস্য...নৃত্য...অথবা রমনের বিভিন্ন ভঙ্গীমা...আমি -

- কি ব্যাপার? তোমার কি শরীর খারাপ নাকি? - টেলিফোন নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন তিনি। তীক্ষ দৃষ্টিতে তাকালেন।

এক পলক চোখে চোখ রেখে সে দৃষ্টি সরিয়ে নিল, বলল - না তো।

- তোমাকে ঠিক সুস্থ লাগছে না। কেমন শুকনো শুকনো লাগছে। কাল রাতে কি খুব বেশী ড্রিঙ্ক করেছ?

সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

- কালকে হঠাৎ চোখে পড়ল, তুমি আর হিরন্ময় সামন্ত হোটেলে ঢুকছ -

- আপনি জানেন আমি ড্রিংক বেশি করি না - তার চোখে মুখে বিরক্তি (আমি কখন কোথায় যাচ্ছি তাও নজর রাখে নাকি) কখনোসখনো করলেও মাত্রা ছাড়া নয়।

- শুনে সুখী হলাম না - তিনি উচ্চকণ্ঠে বললেন, সোজা চোখে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। তাঁর চোখের তারা কালো নয়, ধূসর।

সে আবারও এক পলক তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিল (হুঁ! বাঘের মতো তাকানো! এসব বাজে কথার কি দরকার, কাজের কথাই ভাল। মাখামাখি অন্তরঙ্গতা আমার ভাল লাগে না)

তিনি সামনের দিকে একটু ঝুঁকলেন, দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ, বললেন - আমি মনে করি এগুলো সুস্বাস্থ্যের লক্ষ্মণ - এইসব - এই প্রাণ খুলে হাসা, বেহিসাবি

গতিতে কখনো কখনো গাড়ি চালানো, কোন দিন এক পিপে মদ গিলে ফেলা-

মিসেস ডিক্রুজ টেবিল থেকে একটা ফাইল তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন, সে আড় চোখে দেখল, আরও গম্ভীর হলো।

মিস্টার সান্যাল চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিলেন, সে আরও গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিল দেখে তিনি বোধহয় হঠাৎ চুপ করে গেলেন, গম্ভীর মুখে বললেন - তোমাকে আমি কখনো হাসতেই দেখিনি। যাক্ গে, কাজের কথায় আসা যাক। আমরা কিছু লেডি স্টেনোগ্রাফার নেবো। ডাইরেকটর বোর্ড ঠিক করেছেন যে সমস্ত অফিসারের সেক্রেটারী বা পি. এ. পুরুষ আছেন তাঁদের জায়গায় মহিলা নিয়োগ করা হবে। যাঁদের লেডি সেক্রেটারি আছেন তাঁদের ব্যাপারে কোনো গন্ডগোল নেই, কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে পুরুষ আছেন দেখা যাচ্ছে সেসব ক্ষেত্রে কোম্পানির অনেক গোপন তথ্য - যেমন অর্থনৈতিক অবস্থা, লাভ লোকসান, আগামী দিনে ব্যবসার গতিপ্রকৃতি - এ সমস্ত তথ্য ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। এতে আমাদের খুবই অসুবিধা হচ্ছে। এবারে কর্মীদের ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দাবি দাওয়া ব্যাপারে আলোচনার সময় এমন সব তথ্য ইউনিয়নের তরফ থেকে দেখানো হয়েছে যেগুলি গোপনীয়।

ব্যাপারটা তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি, তুমি পার্সোনেল অফিসারের সঙ্গে বসে এই চাকুরির বিষয়বস্তু কিভাবে হবে ওর সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করে নিও। আমি আজ দুপুরের ফ্লাইটে বম্বে চলে যাচ্ছি।

যা বলছিলাম - চাকুরির শর্ত অনুযায়ী লেডি স্টেনোরা ইউনিয়নের আওতায় নয়। তাছাড়া সকলের সঙ্গে মেশামিশিও তাদের সীমিত। এখন থেকে তাদের দুপুরের লাঞ্চ অফিসারদের ডাইনিং হলেরই একদিকে ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এটা আার কিছু নয়, খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে তাদের অতিরিক্ত কিছু বেশি সুবিধা দিয়ে অন্যদের সাথে তফাৎ করে রাখা। এভাবে গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে আমরা তাদের আরও সজাগ করতে পারব। ঠিক আছে?

সে ঘাড় নাড়ল। মিস্টার সান্যাল সিগারেটের প্যাকেট খুলে তার দিকে এগিয়ে দিলেন, সে সিগারেট নিলো। তিনি তাঁর সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দিয়ে

নিজে ধরালেন। আগুন ধরাতে গিয়ে চকিতে চোখে চোখ পড়তে সে দেখল ওনার চোখে হাসি ছলছল, মুহূর্তে তিনি হেসেও উঠলেন, সিগারটে দীর্ঘ টান দিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে একটু দুলে নিলেন, বললেন - হ্যান্ডসাম, স্মার্ট, ইয়াং এইসব কথাগুলি তোমার বিজ্ঞাপনে অবশ্যই জুড়ে দিও।

- আমি কি এখন যেতে পারি? সে জিজ্ঞাসা করল।তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন, বললেন - হ্যাঁ, তারপর টেবিলের কাগজপত্রে মনোনিবেশ করলেন। সে উঠে দাঁড়াল, চলে যেতে গিয়েও হঠাৎ কি ভেবে আবার ফিরে দাঁড়াল, বলল - ব্যাপারটা কি আমার জন্যও? মানে আমার জন্যও কি লেডি সেক্রেটারি দেওয়া হবে?

- নিশ্চয়ই! - তিনি মুখ তুলে তাকালেন।

- কিন্তু সরকারবাবু আমার কাজকর্ম ভালই করেন। আমার আগে যিনি ছিলেন - মিস্টার সেন - তাঁর আমলের লোক, আমি মিস্টার সেনের অধীনে সহকারী হিসেবে যোগ দিয়েছিলাম, তখন থেকে উনিই আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছেন। বয়স্ক মানুষ, সব কিছু জানেন -

- ঠিক কথা, সব কিছু জানা লোকের হাত থেকেই তো সবকিছু জানাজানি হয়ে যায় - গম্ভীর গলায় বললেন মিস্টার সান্যাল।

- আমার কিন্তু সরকারবাবুকে সরিয়ে দেবার মোটেই ইচ্ছা নেই - প্রায় কর্কশ গলায় বলল সে - ওনাকে সরিয়ে দিলে আমার কাজের অসুবিধা হবে। অনেক কাজকর্ম যেগুলি উনি নিজেই করে নেন সেগুলি সব আমার ওপর পড়বে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলেন,তারপর - এর মানে তুমি নিজেকে অকর্মণ্য বলতে চাইছ। অর্থাৎ কি না তোমার নিজের সব কাজ তুমি নিজে করতে পারো না। বাঃ! তাহলে তো তোমাকে চাকরিতে রাখা চলে না।

- আপনি কি বলতে চাইছেন?

- আমি কিছুই বলতে চাইছি না, শুধু কোম্পানির ইচ্ছা তোমাকে মেনে নিতেই হবে। সুতরাং সরকারবাবুকে অন্য কোথাও দেওয়া হবে আর তোমাকে -

- কিন্তু একটা কথা, আমার অফিস পাবলিসিটি অফিস, সেখানে সব কিছুই

প্রকাশ করে দেওয়ার জন্য - সে সূক্ষ বাঁকা হাসি মিশিয়ে কথা বলল, যেন খুব একটা চাল দিয়েছে এভাবে বলল - তাই আমার অফিসে গোপন কোনো কিছু ফাঁস হয়ে যাওয়ার মতো তথ্য নেই, তাই নয় কি? - কথা শেষ করে সে চেয়ারের মাথায় হাত রেখে ঈষৎ বাঁকা ভাবে দাঁড়াল।

আবারও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তিনি তাকিয়ে রইলেন, সরু গোঁফের প্রান্তে আঙুল বোলালেন, এবং - এরকম অকর্মন্য একজনকে আমি এরকম দায়িত্বপূর্ণ পদে বসিয়েছি জানতাম না - খুবই ভারী শোনাল তাঁর কণ্ঠস্বর, বললেন - যে অফিসারের ধারনা তার অফিসে কোনো গোপন কাগজপত্র নেই তাকে কি করে এমন দায়িত্বপূর্ণ পদে রাখা যায়? আমি এক্ষুনি তোমাকে বরখাস্ত করার ব্যবস্থা করছি।

(আঃ, ইনি আমাকে চাকরি দিয়ে মাথা কিনে নিয়েছেন! আমার পিতৃবন্ধু! পিতৃদেব তাঁর বন্ধুকে চিঠি লিখে দায়ীত্ব পালন করেছিলেন, আর ইনি বন্ধুপুত্রকে একটি আকর্ষণীয় পদে চাকরি দিয়ে করুণা করেছেন, আর তাই যা ইচ্ছা তাই বলার অধিকার অর্জন করেছেন!)

তারা পরস্পরের চোখের দিকে অপলক তাকিয়ে, যেন যুদ্ধের পূর্বে দুই যোদ্ধার মতো। মুহূর্তে যেন ঝাঁপিয়ে পড়বে পরস্পরের ওপর।

- এখন ঠিক করে নাও - তিনি কাটা কাটা কথা বললেন - হয় বরখাস্তের চিঠি অথবা -

সে ঠোঁট কামড়ালো, তারপর ফিরে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

তার পিছনে অট্টহাস্য গমগম করে উঠল।

সে করিডোর দিয়ে মাথা নীচু করে ধীর পায়ে এগিয়ে চলল লিফটের দিকে।

....আজ প্রায় পাঁচ বছর আমি এখানে এসেছি, এই পাঁচ বছরে এনার অনেক অভিভাবকত্ব আর বেয়াদবি সহ্য করেছি। কেন? কিছু বলিনা, কিন্তু যেদিন মুখ ফুটে বলে ফেলব সেদিন...

আমার কি এরকম বড়সড় চাকরির প্রয়োজন আছে? আমার কতটুকু দরকার? সেই ছোটবেলা থেকে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন আমার হোস্টেল

হোস্টেলেই কেটেছে। কতটুকু প্রয়োজন ছিল তখন? এখনই তো আমি এই ঔদ্ধত্যকে গুঁড়িয়ে চলে যেতে পারি। সামান্য কিছু একটা চাকরি হলেই আমার চলে যাবে। সেটুকু জোগাড় করার সামর্থ্য আমার নেই? আমার বাবা আমার প্রতি অনেক করুণা দেখিয়েছেন। এখন তাঁর বন্ধুর করুণা আমাকে দুপায়ে মাড়াচ্ছে।

....অতঃপর নারী! নারী অর্থ নরম শরীর... শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে সাজানো লাস্য যেগুলি তুমি পুরুষ - তোমার শরীর ও মনের ওপর ক্রিয়া করবে এবং বিশেষ এক অনুভূতি যার নাম কাম -

সেই বিশেষ অনুভবে ক্রমশঃ দুর্বল তুমি এভাবে নিজস্ব সত্ত্বা হারিয়ে গেলে তুমি নারীর কুক্ষিগত.... এভাবে নারী তার শরীর হাস্য লাস্য কটাক্ষ ছলনা দিয়ে পুরুষকে টানে, শয্যাসঙ্গী করে, পূরণ করে নেয় নিজের চাহিদা... এভাবে পুরুষ নারীর কুক্ষিগত হয়ে নির্বিবাদে মেনে নেয় দাসত্ব। নারীর সকল সুখের উপকরণ জুটিয়ে এনে তাকে মোহিত করতে চায়। এভাবে নারী পুরুষকে দিয়ে তার ঘর গড়ে নেয়, তিলতিল করে আদায় করে নেয় সব সম্পদ ...এভাবে নারী পুরুষকে সন্তানের জনক হতে বাধ্য করে...

নিজের চেম্বারে এসে ঢুকল সে। খুবই চিন্তিত। মাথা এভাবে ঝুঁকিয়ে যেন ভারী কিছু মাথায় চাপানো।

আঃ, মাথার মধ্যে কি ভীষণ যন্ত্রণা। গত রাত প্রায় নির্ঘুম কেটেছে। আমার ভেতরে এক ক্ষুধিত শ্বাপদ বাস করে। হিরন্ময় জানে, বোঝে, আর বোঝে বলেই এরকম খুঁচিয়ে আনন্দ পায় না কি? সেই নগ্ন লাস্য, নৃত্য অথবা রমনের বিভিন্ন মুদ্রার ভঙ্গিমা! কত সহজে শরীর দেখাতে পারো তুমি নারী... অঙ্গের যত মদির উচ্ছাস...

সে খুব জোরে কলিং বেলের সুইচ টিপল। বেয়ারা চা নিয়ে ঘরে ঢুকল, টেবিলে রাখল, বলল - কিছু বলছিলেন স্যার?

- হ্যাঁ, মাথা ধরেছে, একটা কিছু ট্যাবলেট কিনে আনতে পারো?

বেয়ারা মাথা নাড়ল, সে মানিব্যাগ বার করে টাকা দিল। বেয়ারা বেরিয়ে গেল।

সে কাজে মন দিতে চেষ্টা করল।

আাস্তে দরজা অল্প খুলে গেল, দরজার ফাঁকে এক যুবতীর শরীরের আভাস - ভেতরে আসতে পারি - খুব মিষ্টি করে বলল সে।

- আসুন।

মেয়েটি ভেতরে এলো, পিছনে আরও দুই যুবতী। প্রথম মেয়েটির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল সে। শাড়ীতে ঝলমল নানা রঙের বড় বড় ফুলের বাহার। পাতলা শাড়ীর আড়ালে তলপেট নাভির গভীরতা প্রকট অথবা আরও রহস্যময়! .যদিও তোমার ব্লাউসের হাতা অনেকখানি নামানো কিন্তু ওদিকে বুকের ও পিঠের এতখানি কেটে ফেলেছ যে অর্ন্তবাসের ফিতে প্রায় বেরিয়ে পড়তে চাইছে! আঃ, আমার বুকের মধ্যে -

দ্বিতীয় জনের দিকে তাকাল সে। গায়ের রঙ ঈষৎ চাপা, শাড়ির রঙ ঘন নীল... বাবাঃ, নাভীর এত নীচে নেমেছে তোমার শাড়ি - যে কোনো মুহূর্তে খুলে যাবে না তো?.... এরকম দৃশ্যের মধ্যে চোখ রাখলে হে নারী যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যায় শরীরের গ্রন্থিসকল... তৃষ্ণা জেগে ওঠে...শুষ্ক তৃষ্ণা... তৃতীয় জনের ওপর চোখ সরিয়ে নিল সে। মিনি স্কার্ট পরা। হাঁটুর অনেকটা ওপর পর্যন্ত দৃশ্যমান সুপুষ্ট জঙ্ঘা।... আমি দ্রুত গড়িয়ে যাচ্ছি কোনো এক পাহাড়ের গভীর খাদের মধ্যে.... চারিদিকে ওলট পালট দীর্ঘ সব গাছেদের দেহ...

.... এরা সকলে মিলে কি একযোগে আমাকে উত্যক্ত করবে ভেবেছে? সে বাঁহাতের দুই আঙুলে কপাল ও ভুরুতে চাপ দিলো, কয়েক মুহূর্ত এভাবে স্বাভাবিক হতে চাইল। সম্ভবতঃ এরা কোনো অফিসের কর্মী এবং ধরে নেওয়া যেতে পারে আগমনের কারন – বিজ্ঞাপন। সম্ভবতঃ বাৎসরিক উৎসব বা ওই ধরণের কিছু হবেটবে, তার স্মরণিকা ছাপা হবে, অতএব হে মহাশয় বিজ্ঞাপন দিয়া ধন্য করুন এজন্য আমরাএই যুদ্ধের পোষাকে সজ্জিত হইয়া -- বসুন - সে গম্ভীর ও শুকনো গলায় বলল, টেবিলের কাগজপত্রের ওপর মনোনিবেশ করল। সামনের তিনটি চেয়ারে তিনজন বসল।

একটুক্ষণ পরে মুখ তুলল সে, দেখল তার ঠিক মুখোমুখি চেয়ারে বসেছে প্রথম

ঢোকা সেই মেয়েটি, তার বক্ষভার টেবিলের উপর। নেল পলিশ রঞ্জিত দীর্ঘ নখগুলি হিলিবিলি করতে করতে সে লিপস্টিক রঞ্জিত লাল ঠোঁটের ওপর হাসির ঝিলিক দিলো। ঝিকিয়ে উঠল দাঁতের সারি, বলল - আপনার কাছে একটি আবেদন আছে।

- বলুন - আবারও শুকনো গলায় বলল সে।

- আমরা আসছি ব্রুকস এন্ড কোম্পানী ইন্ডিয়া লিমিটেড থেকে। আমাদের রিক্রিয়েশন ক্লাবের এনুয়াল ফাংশন হচ্ছে কলামন্দিরে। এই উপলক্ষে আমরা একটা স্মরণীকা প্রকাশ করব। আপনার কাছে বিজ্ঞাপনের আবেদন।

আদুরে গলায় এতগুলি কথা বলে মেয়েটি আবার হাসল, টেবিল থেকে বক্ষভার তুলে নিলো, চেয়ারে হেলান দিলো। কোলের ওপর রাখা ব্যাগ খুলে মেয়েটি কাগজপত্র বার করল এবং কলম ঈষৎ নত ঘাড়।

...এখন তুমি আমাকে তোমার নমনীয় কাঁধ ও বক্ষের আভাস দেখতে দিচ্ছ হে নারী! আমি বুঝতে পারছি এভাবে তুমি আমাকে বশীভূত করতে চাইছ। তুমি দুঃখিত হয়ো না, আমি সত্যই লোভী হয়ে উঠছি, আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছি তোমার মোহিনী মায়ায়...

মেয়েটি তার হাঁটুর ওপর হাত ব্যাগ রাখল, তার ওপর একটি ছাপা কাগজ, কলম খুলে খাপ বাঁহাতের মুঠোয় রেখে সে ডান হাতে কলম নিয়ে কিছু লিখতে চাইল, তখন তার বাঁ হাতের মুঠো থেকে কলমের ঢাকা মেঝেতে পড়ে গেল।

চকিতে তার মাথার মধ্যে বিদ্যুতের ঝিলিক - সে ভাবল এখন পরপর কি হবে আমি বলে দিতে পারি। এখন তুমি বাঁদিকে ঝুঁকে মেঝে থেকে কলমের ঢাকা কুড়োবে, তখন তোমার বুকের আঁচল সরে যাবে, তুমি ঢাকাটি কুড়িয়ে সোজা হবার সময় তোমার অনেকখানি কাটা ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে আমাকে আকৃষ্ট করে বুকের আঁচল ঢাকবে এবং সেই ফাঁকে চোখের কটাক্ষপাত ও লাজুক হাসি মুখে - আচ্ছা দেখা যাক তুমি কত খেলতে পারো। আমিও লোভী, তোমার সব কিছু তৃষ্ণার্তের মতো দেখব। আমি জানি তোমার সঙ্গিনীরা তোমাকে বলবে - লোকটা কি হ্যাংলার মতো তাকচ্ছিল, যেন গিলে খাবে।তখন

তুমি বিজয়িনীর হাসি হাসবে।....আমি ক্রমশঃ তলিয়ে যাচ্ছি তোমার মায়াজালে...

তার চিন্তার মতোই ধারাবাহিক ঘটনাগুলি ঘটল, মেয়েটি খুব ধীরে বুকের ওপর দিয়ে আঁচল তুলে দিতে দিতে বলল - আমরা কিন্তু আপনার কাছ থেকে স্মরণিকার ব্যাক কভার আশা করছি। খুবই মোহময়ী দৃষ্টি আর আদুরে তার কণ্ঠস্বর। এখন সে দ্রুত গম্ভীর। কপালে ভাঁজ ফেলল, টেবিলের কাগজপত্রে মুখ নামিয়ে বলল - কাগজপত্র রেখে যান, দেখি কি করতে পারি। তবে এখন বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে আমরা একটু কম খরচ করছি।

সে কাজ করতেই থাকল, তিন যুবতী চুপচাপ বসে। একটু পরে মুখ তুলল সে, বলল - ঠিক আছে, দরখাস্ত রেখে যান, পরের সপ্তাহে একবার ফোন করবেন। আবার কষ্ট করে আসার দরকার নেই। সে হাত বাড়িয়ে মেয়েটির হাত থেকে কাগজটি নিলো, পুনরায় টেবিলের ওপর ঝুঁকে কাজে ব্যস্ততার ভান করল। তিন যুবতী উঠল, দরজার দিকে এগিয়ে গেল, সে কটমটে চোখে পিছনে তাকিয়ে চোয়াল শক্ত করল।

.... কত সহজে তুমি শরীর দেখাতে পারো নারী। অতচ লজ্জা - সে তো নারীর ভূষণ! আসলে নারীর লজ্জা - অর্থ আরও বেশী নির্লজ্জতার সরস ভঙ্গীমা!

.... আর এই বুড়ো আমাকে আরও বেশি ঝামেলায় জড়িয়ে দিচ্ছে। লেডি স্টেনো - মানে এরকম কেউ আসবে, ঘুরতে ফিরতে মোহময় হাসি হাসবে, ডিকটেশন নিতে গিয়ে বুকের আঁচল ফেলবে।হায়, কি হবে? সারাক্ষণ নির্জন ঘরে এভাবে - আমি কি পাগল হয়ে যাব?

.... মাথার যন্ত্রণাটা বেড়ে গেল। গতকাল সারারাত প্রায় নির্ঘুম... শরীর জুড়ে হানাদার....আমি জানতাম না আমার মধ্যে বাস করে এক ক্ষুধিত শ্বাপদ। হিরন্ময় তাকে খুঁচিয়ে জাগিয়েছে। বিশেষতঃ গতকাল তার অস্ত্র প্রয়োগ - খাওয়ানোর নাম করে সে আমাকে নিয়ে গেল সেই নৃত্য নাকি নৃত্যের নামে...

দুহাতে কপাল চেপে চোখ বুজল সে, একটু স্বস্তি পেতে চাইল। দরজা খোলার শব্দ -মুখ তুলে তাকাল সে। বেয়ারা ট্যাবলেট ও জলের গ্লাস নিয়ে ঢুকল। ট্যাবলেট খেল সে, গ্লাস নামিয়ে রাখতে গিয়ে চোখ পড়ল চায়ের কাপের দিকে,

সাগ্রহে হাত বাড়াল।

- সে কি? আপনি এখনও চা খাননি ? ও তো ঠাণ্ডা জল হয়ে গেছে।

হতাশ সে হাত সরিয়ে নিলো, চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল।

- আমি আরেক কাপ চা এনে দিচ্ছি স্যার - বেয়ার ঠান্ডা চায়ের কাপ তুলে নিয়ে ববেরিয়ে গেল।

সহসা যেন মেঘ গর্জনের শব্দ - সে জানলার কাচের ওপারে তাকাল - আকাশ জুড়ে ঘন মেঘ, জানালার ধারে উঠে গিয়ে দাঁড়াল সে, আবারও বিদ্যুৎ, আবারও গর্জন। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষের নিখুঁত বন্ধ জানালা দরজা দিয়েও সে গর্জন ঘরে ঢুকে পড়ছে। বিদ্যুৎ দেখল সে, মেঘ দেখল, ঝড় উঠেছে। এ শহরে গাছ বড় কম, তবু কাছে দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গাছেরা আকুলি বিকুলি করছে, ঝড়কে স্বাগত জানাচ্ছে। নীচের রাস্তায় উড়ছে ধুলো, কাগজের টুকরো, শালপাতা - আরও কত কি। লোকজন দ্রুত পায়ে চলে যাচ্ছে - দেখতে সে জানলার কাচে মুখ চাপল। কয়েক মুহূর্ত ওই সব কিছু দেখল সে, দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।ঝড়ের মতোই নেমে এলো লিফট।রাস্তায় ঝড় তাকে আলিঙ্গন দিলো। বড় বড় চুল ভীষণ এলোমেলো - সে দুহাতে সামাল দিতে চাইল। শার্টের ভেতর বাতাস ঢুকে ফুলে উঠছে, যেন প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে বাতাস তার শরীরের গভীরে অনুপ্রবেশ করছিল। চোখে মুখে ধুলো এসে লাগছে, ভাল করে তাকানো যায় না, তবু সে হাঁটতে তাকল। তার মুখ বড় আনন্দময়। আনন্দিত মুখে আকাশের দিকে দেখতে চাইল সে - আকাশে মেঘেরা হুড়োহুড়ি করছে শিশুর মতো। বৃষ্টি বুঝি নামল বলে। একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক মাথা নীচু করে কেনক্রমে এগিয়ে আসছিলেন, কাছাকাছি এলে সে ভদ্রলোককে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করল - আচ্ছা আজ বাংলা মাসের ক তারিখ? কি মাস এটা? এত দ্রুততার মধ্যেও থমকে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক তাকে এক নজর দেখলেন - মুখ কুঁচকে মৃদু গলায় বললেন -পাগল না কি? চলে যেতে যেতে বললেন - তারিখ জানি না, তবে এটা আষাঢ় মাস। বৃষ্টি নেমেছে। বড় বড় ফোঁটা তীরের মতো ছিটকে পড়ছে।

সোঁদা গন্ধে ভরে উঠল বাতাস। সে বুক ভরে সুগন্ধ নিলো। ভিজে যাচ্ছে, তবু হাঁটতেই থাকল। তার মাথার যন্ত্রণা ঝরে যাচ্ছিল, শরীরের যন্ত্রণা ঝরে যাচ্ছিল। স্নিগ্ধতায় ভরে উঠছিল সে।

তিন

.... রাত্রি এলে রক্তের ভিতর বিষধর সাপ খেলা করে। কে খেলায়? সাপেরে খেলায়? নেপথ্যে কোথায় যেন বেজে চলে উদ্দাম সঙ্গীত। লাস্যময়ী প্রায় নগ্ন নারী এক কি সোহাগে শরীর নাচায়। মুহূর্ত মুহূর্তে তার হাসি.... চমকে ওঠে বিদ্যুৎ ঝিলিক, রক্তের ভিতর অমনই চমকে ওঠে ক্রীড়ারত সাপ, ঢেলে দেয়, বিষ ঢেলে দেয়....কে খেলায়? সাপেরে খেলায়?... শরীরে আগুন, সারা শরীরে আগুন। সে কি বিষের আগুন? না কি নগ্ন নারী হাত ধরে নিয়ে যায় অগ্নিকুন্ডে? সমস্ত শরীর পুড়ে যায়...অথচ সে নারী কত আনন্দ উচ্ছল। তার সমস্ত শরীরের বিপুল লাবণ্যরাশি আগুনে পোড়ে না। বরং কি সুন্দর এক রক্তাভ সোনালী আলো ও শরীর উজ্জ্বল করে....

এবম্বিধ অনুভবে অসহায় সে শুয়েছিল নীদ্রাহীন। রাত নিঝুম। ক্বচিৎ কখনো দ্রুতবেগে ছুটে যাওয়া গাড়ির শব্দ রাস্তা থেকে উঠে আসছিল। ঘর অন্ধকার। এবং অন্ধকার যে কোন দৃশ্যের অনায়াস লীলাক্ষেত্র।

ইদানীং প্রতিটি রাত্রিই এমন যন্ত্রণাময়। তার নিজস্ব কবিতার জগৎকে ভীষণ আঘাতে ভেঙে চুরমার করেছে হিরন্ময়। আলাপের প্রথম দিন থেকেই হিরন্ময় এ ব্যাপারে সক্রিয়। ও বুঝি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে তাকে গন্ডীর বাইরে এনে তছনছ করে দেবে, তাই দিনে দিনে শুরু করেছে ছোট ছোট অস্ত্র প্রয়োগ। এভাবে ধীরে ধীরে গ্রাস করতে করতে সেদিন ছুঁড়েছে ব্রহ্মাস্ত্র। সেদিন সকালে অফিস আাসার সময় হিরন্ময় বলল - একটা দারুণ সুসংবাদ আছে হে, আমার স্ত্রী একটি পুত্র সন্তান উপহার দিয়েছেন, এজন্য তোমার একটা খাওয়া

পাওনা, কারণ তুমিই একমাত্র লোক যে বলেছিল আমার ছেলে হবে। রোজ সকালে কোম্পানির একটি এ্যামবাসাডার গাড়ি তাদের অফিস নিয়ে আসে। প্রথমে হিরন্ময়কে তুলে গাড়ি চলে আসে তার ফ্ল্যাটের কাছে, তারপর যায় মিস্টার সরখেলের বাড়ি, ওখান থেকে সোজা অফিস। যাতায়াতের পথে এই সময়টুকু হিরন্ময়ের বিশ্রম্ভালাপের সময়।

হিরন্ময়ের সন্তানের ব্যাপারে এরকম ভবিষ্যৎবানীর কথা শুনে সে অবাক, বলল, কি আশ্চর্য, আমরা এ ব্যাপারে কিছু আলোচনা করেছিলাম বলে তো মনে পড়ছে না, আমি তো জানতামই না -

হিরন্ময় হো হো করে হেসে উঠে তার পিঠে একটা থাপ্পড় দিয়ে বলল - ওটাই তো মজা! তোমার কি মনে আছে একদিন আমি তোমাকে দুআঙুল তুলে একটা আঙুল ধরতে বলেছিলাম?

- কোন দিনেরটা? - সে জিজ্ঞেস করল, হিরন্ময় মাঝেই ওরকম করে থাকে।

- সেটা আমি কি করে বলব? তবে এটা আমার মনে আছে যতজনকে আমি এব্যাপারে আঙুল ধরতে বলেছি সবাই মেয়ে ধরেছে, একমাত্র তুমিই ছেলে ধরেছ। সেদিনই আমি মনে মনে ঠিক করেছি যদি ছেলে হয় তাহলে তোমাকে খুব খাওয়াবো। আজই রাত্রে চলো।

ঠিক তখন তার ভীষণ অস্বস্তি। একটা বিষ বাতাস যেন গাড়ীর মধ্যে ঘন হয়ে উঠল, শরীরে অস্বস্তি। নিমন্ত্রণ মানেই অনেক মানুষের সমাগম, গায়ে পড়া আলাপ, হাসি কথা বাক্য বিনিময়। ভাল লাগে না।

- আবার ওসব ঝামেলা কেন, এমনিতেই এখন বাড়ীতে সবাই ব্যস্ত -

- আরে না না,বাড়ীতে নয়, বারীতে তুমি খাবে ছেলের অন্নপ্রাশনে, সে তো সকলেই খাবে, এ খাওয়া একেবারে শুধুই তোমার। অবশ্য আমি সঙ্গ দোবো। এ খাওয়া হবে হোটেলে একান্তে। পান ও ভোজন।

সে একটা কিছু বলতে চাইল কিন্তু হিরন্ময় তাকে হৈ হৈ করে থামিয়ে দিলো, বলল - ব্যস ব্যস, আর কোনো কথা নয়, সন্ধ্যার পর আমি তোমার ফ্ল্যাটে আসব, একসঙ্গে বেরুবো। তুমি তৈরী থেকো। যদিও এরপর আর আপত্তি করার

কিছু থাকেনা তবু সে আপত্তিতে গুনগুন। কিন্তু তখন গাড়ি পৌঁছে গেছে মিস্টার সরখেলের বাড়ির সামনে। উনি দাঁড়িয়েই ছিলেন, গাড়ি থামা মাত্র উঠে পড়লেন। অতএব তার মুখ বন্ধ।

সন্ধ্যা পার করে হিরন্ময় যখন এলো তখনও সে অলস শুয়ে। কলিং বেলের আওয়াজে সাধুদা দরজা খুললে সে বুঝতে পারল হিরন্ময়ের আগমন, কিন্তু তার উঠতে ইচ্ছা করছিল না। - এ কি? তুমি এখনও শুয়ে? ওঠো ওঠো, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। তোমার লোকাল গার্জেনকে বলেছ তো রাত্রে খাবেনা? আচ্ছা আমি বলে দিচ্ছি। ওঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায়না, ফেরার সময় অত করে বললাম তৈরি হয়ে থাকতে, সেই তুমি সময় নষ্ট করলে। সাধুদা -- বলেছি, সাধুদাকে বলেছি,রাতে বাইরে খাবো - সে ব্যস্ত হয়ে বলল - তুমি বসো, আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি - হিরন্ময়কে কাঁধে চাপ দিয়ে সে বসিয়ে দিলো। সাধুদা হিরন্ময়কে ঠিক পছন্দ করে না। পষ্টাপষ্টি একদিন বলেই দিয়েছে - এই বাবুটিকে আমার কেমন কেমন লাগে, তুমি দাদাবাবু এর সঙ্গটি এড়িয়ে চলতে পার না? - একথা শোনার পর থেকে হিরন্ময় এলেই সে ওকে আড়াল দিয়ে রাখে, কে জানে কি বলতে কি বলে দেবে সাধুদা!

অনিচ্ছা সত্বেও সে বেরোনোর জন্য তৈরি হয়। প্রতিবাদ করে নিজস্ব ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠা করতে সে পেরে ওঠেনা। যদিও নিজের প্রবল জেদ সম্পর্কে সে ওয়াকিবহাল। কিন্তু এক ধরণের বিষন্নতা তাকে সবসময় আচ্ছন্ন রাখে। এ যেন এক জলাশয় যার কেন্দ্রে সে ডুবে আছে। ককনই সে সেখান থেকে ভেসে উঠতে পারে না। কিংবা হয়ত এই অবস্থাটাই তার ভাল লাগে, সে নিজেই এর বাইরে আসতে চায় না। ডায়েরির পাতায় পাতায় তার কবিতাগুলি বিষন্নতার গাছ পাথর ঘেরা ওই জলাশয়ের মতে।

রাস্তায় নেমে তার কিন্তু খুব একটা আর খারাপ লাগে না। বাইরে বেশ হাওয়ার বেগ, মনে হয় আকাশে মেঘসঞ্চার। রাস্তার দুপাশে গাছপালা দোদুল্যমান। এসব ভাল লাগছিল তার।

- এই মরেছে, বৃষ্টি আসবে নাকি? - হিরন্ময়।- বৃষ্টি এলে ভালই হয় –

কদিন ধরে এরকমই চলছে, মেঘ জমছে আর উড়ে যাচ্ছে।

- না না, এখন আর বৃষ্টি এসে দরকার নেই, ফুর্তিটাই মাটি হয়ে যাবে। চল চল, একটু পা চালিয়ে, ওদিকে পেট্রল পাম্পের কাছে ট্যাক্সি পাওয়া যেতে পারে - বলতে বলতে হিরন্ময় প্রায় ছুট লাগাল।

ট্যাক্সি।

চৌরঙ্গী।

হোটেল।

মৃদু আলোকে মোহময় যে হলঘরে হিরন্ময় তাকে নিয়ে গেল দরজা খোলা মাত্র উদ্দাম যন্ত্রসঙ্গীত সে ঘরে তাদের স্বাগত জানালো। প্রায় পূর্ণ সমস্ত টেবিল।

- আমার টেবিল বুক করা আছে, সামনের দিকে - ফিসফিস করে বলল হিরন্ময়।

নির্ধারিত টেবিলে বসেই হিরন্ময় অর্ডার দিলো - দুটো ডবল পেগ হুইস্কি, ম্যাকডোয়েল।

হিরন্ময়ের হুকুম শুনতে শুনতে সে অবাক, সে দেখল সামনের মঞ্চের মতো জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে নর্তকী। সে স্তম্ভিত।

নর্তকীর মাথায় জরির শীষ মোরগের ঝুঁটির মতো অস্থির। উন্মুক্ত কাঁধ পেরিয়ে প্রায় উন্মুক্ত বক্ষের ওপর দৃষ্টি থমকে যায় - সেখানে স্বল্পাবৃত বক্ষে জরির অস্থির ঝালর। তারপর আবার উন্মুক্ত সায়র যেন থমকে আছে। সায়রের নিম্নপ্রান্তে ত্রিকোন ঊজ্জ্বল এক সোনালী জরির দ্বীপ। তারপর নগ্ন দুই জঙ্ঘা - দুই উত্তাল ধারা যেন নিম্নমুখী। দেখতে দেখতে তার দৃষ্টিতে আগুন শরীরে আগুন। হাতে চাপ পড়লে আচ্ছন্নতা ভেঙে সে দেখল হিরন্ময়ের উল্লসিত মুখ।

- এটা নাও - ডবল পেগ হুইস্কির গ্লাস এগিয়ে দিল হিরন্ময়।

বেয়ারা কখন দিয়ে গেল সে জানে না। বরফের ভাসমান টুকরোর দিকে তাকিয়ে সে বলল - এ যে অনেক!

- আজ সব কিছুই অনেক হবে - দুই গ্লাসে সোডা মেশাতে মেশাতে বলল হিরন্ময়।

- চিয়ার্স! চিয়ার্স!

বাজনার উত্তাল শব্দে না কি পানীয়ের ধাক্কায় কেঁপে উঠল চারিদিক। ওই হিল্লোলিত নর্তকীর শরীর।

- দেখো দেখো, চোখের সবটুকু দৃষ্টি দিয়ে দেখো - ফিস্ ফিস্ করে বলল হিরন্ময় - তোমার ভেতরের ওই তুমি,ওকে সন্তুষ্ট করো। কি করে যে বেঁচে আছ! নাও, ভোগ করে নাও।

কথা শুনতে শুনতে সে হিরন্ময়ের মুখের ওপর দৃষ্টি রাখতে চাইল, কিন্তু -

...আমার দৃষ্টি চুম্বকের টানে - অথচ কেমন এক সঙ্কোচ। কিন্তু কাকে সঙ্কোচ? হিরন্ময়কে? ওর দৃষ্টি তো নিবদ্ধ ওই শরীরের দিকে। তাহলে? তাহলে সঙ্কোচ কি নিজের কাছে?

....কি আগুন! দৃষ্টি জ্বলে যায়... ওই উত্তাল বুক... বুক থেকে নেমে নাভিদেশ পেরিয়ে উরুর সন্ধিস্থলে... এবং উত্তুঙ্গ জঙ্ঘা - কোথায় থামবে চোখ? একসাথে কতটুকু দেখা যায়? আমার দৃষ্টিকে আমি রাখব ওর মুখে।ওই সুন্দর মুখের দিকে আমি কি দেখব না? বড় পাপী হয়ে উঠছে ওর শরীর। কিন্তু আমার দৃষ্টি আমারই অবাধ্য হয়ে যায়... মঞ্চ থেকে নেমে এলো উচ্ছল সুন্দরী। তার অঙ্গে কখনো সবুজ আলো কখনো রক্তিম।

- কি করে যে বাঁচো তুমি সুদেহী যুবক - বিড়বিড় করে বলে হিরন্ময় - আমি বুঝতে পারি না। উপবাস আমাকে কি অস্থির করে, অথচ তুমি -

....অদৃশ্য কারো সাথে সঙ্গমে রত কি ওই মেয়ে? কি অস্থির ভঙ্গি ওই শরীরের।আমি কি পাতালে যাবো? পাতালে কি সঞ্চিত আছে শান্তির পরিবেশ?

- প্রাণ ভরে উঠছে তো? - গায়ে হাত দিয়ে তার দিকে ঝুঁকে এলো হিরন্ময় - চিনি চিনি তোমাকে রসিক! তোমার ওই সুন্দর চেহারা, ওই চোখ - প্রথম যেদিন দেখেছি সেদিনই বুঝেছি! - যেন প্রমিকের কানের কাছে গুঞ্জন করে হিরন্ময়।

- এই হিরন্ময়, তোমার নেশা হয়ে গেছে।

- মোটেই না, নেশা হয়েছে তোমার, তবে গেলাসে নয়, ওই ওখানে। গেলাস

তো তোমার অর্ধেকও খালি হয়নি - বলতে বলতে নিজের গ্লাসের সামান্য তলানিটুকু টেনে নিয়ে এতক্ষণের নীচু স্বর ঈষৎ উঁচু করে হিরন্ময় ডাকল - বেয়ারা -

আর নর্তকী তখন তাদের খুব কাছে। মাত্র এক হাতেরও কম ব্যবধান। ঈষৎ নীচু হয়ে বাজনার তালে তালে বক্ষ দোলায়। অস্থির জরির ঝালরে আলো ঝিকমিক করে। দুই স্তনের মধ্যস্থলে ও কি গভীরতা! কি রহস্যময় অন্ধকার!...

সে কি হাত তুলেছিল? চকিতে নর্তকী তার হাত টেনে নিলো, মুহূর্তে বুলিয়ে নিলো বুকের উন্মুক্তস্থলে। সে চমকিত। চোখে চোখ, চঞ্চল চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক দিয়ে চকিতে সরে গেল। হাত যেন পুড়ে গেল তার।

- ব্রাভে! ব্রাভো! হাততালি দিয়ে উঠলো হিরন্ময়।

প্রায়শই রাত্রিকালে সে এখন এসব দৃশ্যের মাঝে চলে যায়। অন্ধকার ঘরে নিদ্রার আয়োজন কালে কোন ফাঁকে ঢুকে পড়ে অন্য চিন্তাধারা, সে চিন্তা নিম্নমুখী।আড়ালে কোথাও কি হিরন্ময় হাততালি দেয়? হাসে? কিন্তু তবু সে হিরন্ময়ের ওপর বিরূপ হতে পারে না। আলাপের প্রথম দিন থেকেই ও এমন একটা ছায়া ফেলেছে মনে! সারল্য ও শয়তানী দুয়ে মিলিয়ে হিরন্ময় এমনই কিছু যে ওর ওপর বিরূপ হওয়া যায় না। বরং কেমন এক দুর্বলতা দিন দিন বেড়ে ওঠে।

হিরন্ময়ের সঙ্গে আলাপের প্রথম অভিজ্ঞতাই ছিল অদ্ভুত! সেদিন অফিসের গাড়ি প্রথম তাকে নিতে আসবে। সে সময় মতো নেমে এসেছে, দাঁড়িয়ে আছে ফুটপাথে, গাড়ি এসে দাঁড়াল। গাড়িতে হিরন্ময় একা বসে, পিছনের সিটে, জানলার ধার ঘেঁষে - এধারে - যেধারে সে দরজা খুলে উঠবে।

দরজার হাতল ঘুরিয়ে সে ভাবল ভদ্রলোক নিশ্চয় ওপাশে সরে গিয়ে তাকে জায়গা করে দেবেন, কিন্তু না, উনি চুপচাপ বসে তার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে। সে বুঝতে পারছিল না কি করবে। সে ইতঃস্তত করতে কয়েকটি মুহূর্ত কেটে গেলে সে শুনল - আপনাকে তো ও পাশে বসতে হবে, এদিকটা যে আমি রোজ বসি। কিছু না ভেবেই তাড়াতাড়ি সে ঘুরে ওপাশে যেতে চাইল সে,

তখন শুনল - আরে শুনুন শুনুন -

দরজা খুলে হিরন্ময় নামল, ব্যস্ত ভাবে বলল - দাঁড়ান দাঁড়ান, ওদিকে যাচ্ছেন কেন? আমি কি আপনাকে ওদিক দিয়ে উঠতে বলে দুর্ঘটনার রাস্তা তৈরি করব? না না রোজ আমি এরকম নেমে দাঁড়াব, আপনি উঠে ওপাশে সরে যাবেন।

ব্যাপারটা কিছুই তার বোধগম্য হলো না। অত সব বিশ্লেষনের প্রয়োজন নেই ভেবেই সে উঠে ওপাশে সরে বসল। হিরন্ময় উঠে দরজা বন্ধ করল, গাড়ি চলল।

- অভ্যাস ব্যাপারটা বুঝলেন সাংঘাতিক - হিরন্ময় বলল - এই দেখুন না, আপনি তো ডান হাতে সিগারেট খাচ্ছেন, বোঝা যায় ওটাই আপনার অভ্যাস, কিন্তু সিগারেট টা বাঁ হাতে ধরে টানুন তো, দুচার টান পরেই মনে হবে ঠিক জুত হচ্ছে না, তাই না?

সে অস্বস্তিবোধক হাসি হাসল, বলল - হতে পারে।

- হতে পারে নয়, হবেই। আবার মাঝামাঝি করে বলছেন কেন? হ্যাঁ ও না, না ও না? সত্যি কথাটা স্বীকার করলে কি আপনার সম্মান নষ্ট হবে হে সুকুমারবাবু?

নাম শুনে সে অবাক - আমার নাম কিন্তু সুকুমার নয় - বলল সে।

- জানি গো জানি, আমাকে তুমি না চিনলেও আমি যে তোমাকে যেদিন দেখেছি সেদিন থেকে তোমার ওই ভাসা ভাসা চোখের -

প্রায় চুপিচুপি কথাগুলি বলল হিরন্ময়, কেমন হাসি হাসি দৃষ্টি - বলতে বলতে হঠাৎ কথার মাঝখানে থেমে বলল - কিন্তু সেকথা পরে, যে কথা হচ্ছিল আগে সেটাই হোক, ওই যে সুকুমার -

সে কেমন ধাঁধার মধ্যে, ব্যাপারটা রসিকতা নাকি ব্যাঙ্গ? না কি অন্য কিছু? অন্য কিছুই বা কি? আমাকে হঠাৎ তুমি বলে সম্বোধন কেন? অবশ্যই আমি ভদ্রলোকের নাম জানি না বা এত বড় অফিসের কোন অংশে কোন পদে আছেন তাও জানিনা। এত সব ভাবনার মাঝে হিরন্ময় হঠাৎ বলল - আচ্ছা,

সুকুমার মানে কি? - বলেই আবার নিজের প্রশ্ন নিজেই ফেরত নিয়ে বলল - আচ্ছা থাক, আপনি আগে বলুন কুমারী মানে কি?

দেশপ্রিয় পার্কের মোড়ে এই অফিস টাইমে হঠাৎ একটা ডবল ডেকার বাস আড়াআড়ি খারাপ হয়েছে, চারিদিকে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল, এই অচল অবস্থার মধ্যে চারপাশে তাকাতে তাকাতে সে যেন হতচকিত, কুমারী শব্দের ঠিকঠাক মানে খুঁজতে লাগল, কিন্তু পেল না। জড়ানো গলায় বলল - কুমারী মানে এই আর কি অবিবাহিতা মেয়ে - মানে - আনটাচ্ ট লেডি।

- আপনি সত্যিই বড় মাঝামাঝি কথা বলেন। অত ঢোক গিলে গিলে বলবার কি আছে? সোজাসুজি বলতে পারেন না - যে মেয়ে কোনো পুরুষের সঙ্গে সহবাস করেনি - এই তো?

তার কান গরম হয়ে উঠল, মুখে রক্তোচ্ছাস। চকিতে একবার চালকের দিকে তাকাল সে। যদিও আস্তে কথা আর ইঞ্জিনের গুনগুন শব্দ, তবু -

- এবার দেখা যাক কুমারী মানে যদি ওই হয় তাহলে কুমার মানে কি হওয়া উচিত? - বলল হিরন্ময় - কুমার মানে তাহলে যে যুবক কোনো নারীর -

- আঃ - অস্ফুটে শব্দ করে উঠল সে, কিছুটা ধমকের মতো, আর তাই শুনে হিরন্ময় হা হা করে হেসে উঠল।

- তাহলে আমি আর কি ভুল নামে ডেকেছি? সামন্য এইটুকু কথা শুনে যে মূর্চ্ছা যায় সে সত্যিই দেহে মনে সুকুমার কি না? আমিতো যেদিন থেকে আপনাকে দেখেছি সেদিন থেকেই ওই নাম দিয়েছি। এত কথা বলতে বলতে সহসা চোখ অর্দ্ধোন্মিলিত করল হিরন্ময়, যেনভাবের ঘোরে বলে গেল - ওরে, যেদিন তোকে প্রথম দেখলাম সেদিন ওই চাঁদপানা মুখ আর সুকুমার চেহারা দেখে আমার বুকটা যে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল! হিংসায় জ্বলে যাই জ্বলে যাই!

কথা তো নয়, যেন গরম ঘূর্ণি হাওয়া! সে বিপর্যস্ত হয়ে যায়। পরিচয় এখনও নাম জানা পর্যন্তএগোয়নি, এর মধ্যে তুই! তার চেয়ে বয়সে কিছু বড় যুবকের চেহারা যথেষ্ট মার্জিত ও এক ধরনের তীক্ষ্নতায় সুন্দর। অথচ কথাবার্তাগুলি - এ কি শ্লেষ নাকি রহস্য? বিপর্যস্ত সে কি উত্তর দেবে বুঝতে

পারল না, শুধু বারকয়েক ওর মুখের দিকে তাকাল। সে অনুভব করতে পারছিল এই যুবক তাকে কেমন সম্মোহিত করে ফেলছে।

- তোর এই 'লেডি কিলার ' চেহারা দেখে আমার হিংসা কেন বলত? - আরেকটা বান ছাড়ল।

এ সব প্রশ্নের কোনে উত্তর হয় না, তাই সে অস্বস্তিতে মৃদু হাসল।

- ওঃ! তোর ওই হাসি - বুকে ছুরি মেরে দিলো রে! তোর মতো চেহারা নিয়ে আমি কেন পৃথিবীতে এলাম না এজন্য হিংসে নয়, আমার এই ভেবে হিংসে হয় যে আমি কেন মেয়ে হয়ে জন্মালাম না, তাহলে তোর প্রেমে মজে মশগুল হয়ে সার্থক হতাম - মিটিমিটি হাসছিল হিরন্ময়। আটক গাড়ি হঠাৎ ছাড়া পেয়ে ছুট লাগিয়েছে। জোরে বাঁক নেওয়ার সময় সে কাৎ হয়ে পড়েছিল, হিরন্ময় হাত বাড়িয়ে তার কাঁধ ছুঁলো, সোজা হয়ে বসল সে।

- অবশ্য মেয়ে হয়ে জন্মালে আমাকে সারা জীবন হা হুতাশ করেই কাটাতে হতো - একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল হিরন্ময় - কিন্তু কেন বলতো?

কথাবার্তার ধাক্কা কিছুটা সামলে উঠেছে সে, বলল - কেন?

- কেন আবার, আমার দিকে তুই কি ফিরে দেখতিস? কত সুন্দরী তোর চলার পথে বুক পেতে দিচ্ছে রে! আমার মতো খেঁদি পেঁচির দিকে তুই কি ফিরেও তাকাতিস?

- সুন্দরী অসুন্দরী কোনো মেয়ের প্রতিই আমার কোনো টান নেই - গম্ভীর মেজাজে বলল সে।

বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে চলমান দৃশ্যের প্রতি মনোনিবেশ করতে চাইল সে উত্তর দিল না।

- এই, তুই কি আমার ওপর রাগ করলি? - কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল হিরন্ময়, তার কাঁধে মৃদু স্পর্শ দিলো - যাকে ভাল লাগে তার সঙ্গে আমি এমন ভাবেই কথা বলি - আসনের ওপর এলিয়ে রাখা তার হাতের ওপর হাত রাখল, বলল - আয়, হাত মেলা।

আস্তে আস্তে উপুড় করা হাত চিৎ করল সে, হিরন্ময়ের হাত ধরল। -

যাকে ভাল লাগে না তার সঙ্গে আমি কথাও বলিনা জানিস, এই দেখ না একটু পরে গাড়িতে উঠবে মিস্টার সরখেল, ওই গোমড়া মুখো বুড়োটাকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। ওর সঙ্গে আমার কোনো কথা নেই।

সেদিন অফিসে ঢুকে এ্যাসিস্ট্যান্ট সরকারবাবুর কাছে এই অদ্ভুত মানুষটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা না করে পারেনি সে, এবং জেনে অবাক হয়েছিল এ্যকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের প্রধান এই যুবক কাজের দক্ষতার জন্য যেমন সকলের প্রিয় তেমনই অপ্রিয় তার অদ্ভুত স্বভাবের জন্য। বিচিত্র হিরন্ময়কে আমি কি ভালবাসি না ঘৃণা করি? বোধহয় দুই-ই। নারী সম্পর্কে আমি ছিলাম উদাসীন, এভাবেই আমি বেশ ছিলাম, হিরন্ময় আমাকে থাকতে দিল না। সে আমার শান্ত জীবন বিপর্যস্ত করে দিলে।

....বিপর্যস্ত সে শুয়ে থাকে অন্ধকার সমুদ্রের ভিতর - কিন্তু সমুস্র শীতল নয়, অতলান্ত আগুন।

চার

.... রাত জুড়ে ঘুম....ঘুমের ভেতর ক্লান্তি ঘুমায় বিজন পাহাড়ে স্রোত ছুঁয়ে থাকা নুড়ির মতন....সবুজ পাহাড় সবুজের নদী সবুজ শ্যাওলা শরীরে শরীরে....ঘুম সুখ ঘুম, সুখ সুখ ঘুম....ক্রমশঃ সকাল, শিথিল শরীরে নিরব সকাল ঘাসের শরীরে শিশির যেমন....

এক একদিন খুব সকালে ঘুম ভেঙে মনে হয় এক গভীর প্রশান্তির রাজ্যে সে পৌঁছেচে, মনে হয় বাতাস গান শুনিয়ে যায় আর ফুটি ফুটি আলো শরীরের গভীরে সঞ্চারিত করে দেয় কি এক আনন্দ! একটানা গভীর ঘুমের মধ্যে অতিক্রান্ত হলে রাত্রি এবম্বিধ সকাল আসে, আর এরকম সকালে নিজেকে খুব সতেজ সুন্দর আর সুস্থ মনে হয়।

ঘুম ভেঙে সে চুপচাপ শুয়েছিল। হালকা আলোয় ভরে গেছে ঘর। এখনও ভাল করে রোদ্দুর ওঠেনি। সে অমনই স্থির শুয়েছিল, সামান্য কম্পনটুকুও বুঝি নেই। এভাবে নিঃস্কম্প শুয়ে সে মনে মনে শব্দ সাজাচ্ছিল, ভাঙছিল, আবার

সাজাচ্ছিল.... রাত জুড়ে ঘুম... ঘুমের ভিতর ক্লান্তি ঘুমায়...

সহসা তার মনে হলো ডান দিকে মাথার ওপাশে পুবের বারান্দায় বাইরে থেকে একটা হরিণ অতি সাবধানে জানলা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে। সে একটুও নড়ল না।... আমি নড়লেই এক লাফে হরিণ পালাবে, আর আমি যদি চুপচাপ শুয়ে থাকি তাহলে ও হেঁটে হেঁটে ঘরে আসতেও পারে। তাই সে চুপচাপ শুয়েছিল কিন্তু হরিণ শুধু মাঝে মাঝে উঁকিই দিচ্ছিল। অতএব সে খুব সাবধানে মাথা কাত করল, আড় চোখে তাকাল আর হেসে ফেলল - আহা এই তিনতলার বারান্দায় হরিণ কোথা থেকে আসবে? তা ও এই কলকাতার বালিগঞ্জে! বারান্দায় নানান টবে সাজানো গাছগাছালি, জানালার ওপর মাথা রেখেছে একটি গাছের শাখা, হাওয়ায় নড়ছে।

সে কুব হাসল, দীর্ঘ প্রশ্বাসে বুক ভর্তি করল বাতাসে, তারপর ডবল বেড খাটের ওপাশ থেকে এপাশে গড়িয়ে এলো। খাটের মাথার দিকে খিলান সংলগ্ন একটা ড্রয়ার, সেখানে কিছু কাগজপত্র, একটা বই এলোমেলো ছড়িয়ে। সে উপুড় হলো, একটা কাগজ টেনে নিলো, কাগজের নীচে বই, ড্রয়ার হাতড়ে একটা কলম নিলো, লিখল -

সকালের রোদে জানালার পাশে
অলস আামাকে উঁকি দিয়ে দেখে
লাজুক হরিণ খুব সাবধানে

এভাবে তিনটি পংক্তি পরপর লিখে একটু ভাবল, তারপর লিখল –

রাত জুরে ঘুম
ঘুমের ভিতর ক্লান্তি ঘুমায়
বিজন পাহাড়ে স্রোত ছুঁয়ে থাকা নুড়ির মতন
সবুজ পাহাড় সবুজ নদী

এখানে সবুজ কেটে লিখল - সবুজের নদী - তারপর - সবুজ শ্যাওলা শরীরে শরীরে

ঘুম সুখ ঘুম, সুখ সুখ ঘুম - উপুড় হয়ে শোওয়া ছেড়ে উঠে বসল সে, বালিস

কোলে নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবল, তারপর একটানা লিখল -

ক্রমশঃ সকাল...
শিথিল শরীরে শান্ত সকাল
ঘাসের শরীরে শিশির যেমন।

এরপর একটু চিন্তা করে ' শান্ত ' শব্দটি কেটে লিখল - নিরব - তারপর আগাগোড়া কি লিখেছে পড়ল, লিখল -

সকালের রোদে জানালার পাশে
অলস আমাকে উঁকি দিয়ে দেখে
লাজুক হরিণ খুব সাবধানে।
পাশ ফিরে দেখি কোথায় হরিণ!
নম্র হাওয়ায় ঈষৎ দুলছে
গাছেদের পাতা সবুজ আলোয়।

কাগজ কলম বই ড্রয়ারে রেখে সে বিছানা থেকে নামল, রাতের পোষাক খুলে ফেলল। নগ্ন দেহে আলমারির দিকে হেঁটে যেতে আনমনে শরীরের প্রতিবিম্বে দৃষ্টি পড়ল তার -

কি আশ্চর্য! আমি নিজেকে কতটুকু দেখতে পারি? তাও একসঙ্গে সবটুকু নয়... অথচ শরীর দৃশ্যমান এবং মন শুধুমাত্র অনুভবে....

ভাবতে ভাবতে আলমারি খুলল সে, পাঞ্জাবি ও পায়জামা পরল।

....এখন শরতকাল, সেই শিউলি গাছের তলায় ঝরে আছে অনেক ফুল...ঘাসেরা শিশিরে আর্দ্র, এখন আমি পায়ে পায়ে সেখানে চলে যাবো....

নিঝুম ফ্ল্যাট। তার বাঁদিকে ভারী পর্দা শিলিং থেকে মেঝে পর্যন্ত। আকাশের মতো নীল পর্দার পাশ দিয়ে হালকা পায়ে হেঁটে গেল সে, পর্দার কুচিগুলিতে আদরের মতো হাত বোলালো। এগিয়ে ডাইনিং স্পেস - কাঠের ঝিলমিল দিয়ে ঘেরা চারটে চেয়ার টেবিল। ডানদিকে ঘুরল, বসার ঘর মেঝেয় নীল রঙের জমির ওপর কমলা রঙের ফুল ছড়ানো মোজেক। মাঝখানে নীচু টি-টেবিল, সোফাসেট, একদিকে একটা বেতের আরাম চেয়ার। এ ঘরের একদিকের

দেওয়ালজোড়া আলমারি তাতে ঠাসাঠাসি বই আর বই। সে থমকে দাঁড়াল, টেবিলে খোলা একটা বই, সেদিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ স্থির...বইটার কথা আমি ভুলে গেছি। কালকে সারাদিন আধখানা পড়েছি, তারপর? সন্ধ্যা, রাত্রি? কি আশ্চর্য, আমিভুলেগেলাম?

তাহলে কি বইয়ের প্রতি আমার আকর্ষণ দিন দিন কমে আসছে? সে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল, দুহাতে ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল।....আমি আজকাল অনেক বইটই কিনছি, কিন্তু আমার পড়ার ইচ্ছে? ঠিক ততই কি মরে যাচ্ছে না? অতীতে কি আমি অর্দ্ধেক পড়া বই এভাবে ফেলে রাখতাম? শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি কি ঘুমোতে যেতাম? হায় সেই অতীত! এখন আমি কাজের মানুষ। জীবনের কি মহৎ মূল্যবান কাজ আমি করছি? যতো সব আজেবাজে অর্থহীন কাজ। প্রসাধন দ্রব্য থেকে শুরু করে মেশিন পর্যন্ত নানান বিভাগের উৎপাদন যাতে আরও দ্রুত বিক্রি হয়ে যায় তার জন্য পাবলিকের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হবে।....এই কি আমার জীবনের লক্ষ্য? এজন্যই কি আমি সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করলাম? শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের কতগুলো সার্টিফিকেট জমিয়ে একটা ভাল চাকরির জন্য?....ক্রমশঃ আমি কত সচ্ছলতার মধ্যে ডুবে যাচ্ছি.... আর্থিক সচ্ছলতা আমাকে অনেক বিলাসিতা আর আরামের ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে। আর হ্যাঁ, এখন আমি দস্তুর মতো টাকা খরচ করে দামী দামী বই কিনতে পারছি, কিন্তু....সে টেবিল থেকে বইটি তুলে নিলো, আলমারিতে তুলে রাখল। অনেক বই - ছুঁয়ে ছুঁ দেখল।

....কিন্তু আমি যখন ছাত্র ছিলাম? কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় আমি কত বই পড়েছি। তখন তো আমি পয়সা খরচ করে একটা ছেঁড়া পাতাও কিনিনি। তখন আমার কি ছিল? কলকাতার কয়েকটি বড় বড় লাইব্রেরির কার্ড আর হোষ্টেলের একটা ছোট বিছানা, একটা খুবই সাধারণ টেবিল চেয়ার। অথচ তখন? আমি প্রায় সমুদ্র অতিক্রম করেছি। হোষ্টেল - সে তো পাখি বিক্রেতার খাঁচার মতো ঠাসাঠাসি!...

সে খুব বিষন্ন হয়ে গেল। তার সাজানো গোছানো ফ্ল্যাটের মেঝে দেখল,

আসবাব দেখল, কার্পেট পর্দা।

....তখন পড়ার সময় গোলমাল হলে আমি কখনো বিরক্ত হয়ে কি এরকম ভাবিনি যে আমার যকন নিজস্ব ঘর হবে তখন নির্জনে আমি পাড়ি দেবো অসীম সমুদ্রে। ভেবেছি আমার শক্তি কতটুকু! কতটুকু আমার সাধ্য! তবু আমার একাগ্রতার কোনো ত্রুটি রাখবো না।...

....আমি দিনে দিনে কেমন হয়ে যাচ্ছি। কি যেন শূন্যতা!

শ্লথ পায়ে এগিয়ে গেল সে, বাইরের দরজার ছিটকিনি নামাল, একটু উঁচু গলায় ডাকল - সাধুদা -

- যাই দাদাবাবু - তুমি ওখানে? আমি ভাবলাম বাথরুমে, তাই বিছানার পাশে চা রেখে এলাম -বলতে বলতে এগিয়ে এলো সাধুদা - মাঝ বয়সী, ঈষৎ গোলগাল কালোকুলো একটি মানুষ।

- আমি বেড়াতে বেরোচ্ছি, দরজাটা বন্ধ করে দাও - বলতে বলতে সে ফিরে দেখল - তুমি কদিন দাড়ি কামাওনি?

মুখ নীচু করে রুপোলী আর কালোয় মেশা খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বোলালো সাধুচরণ, একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বলল ইয়ে দুদিন -

- আমার খুব বিশ্রী লাগে। তোমার ধুতি আর গেঞ্জিও কি ময়লা।

- কোথায় ময়লা?

- তুমি তো দেখতে পাবে না! কিন্তু আমি এসব সহ্য করতে পারি না। - বলতে বলতে বেরিয়ে পড়ল।

কলকাতার এই দক্ষিণাঞ্চলের পথ খুবই বিস্তৃত। এপাশে গাড়ি যাবার, ওপাশে গাড়ি আসবার পথ, মাঝে বাগান। রাস্তা পেরিয়ে পায়ে চলার পথ, পাশে বিস্তৃত সরোবর। জলের ধারে ধারে বিশাল বৃক্ষ সকল - মেহগিনি,কৃষ্ণচূড়া, দেবদারু, আরও কত সব - সে জলের ধারে এসে দাঁড়াল।

....আমি কোথায় যেন যাবো ভেবেছিলাম? সেই যে বিছানা থেকে নামলাম কি ভেবে...তারপর তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ব....তখন দুঃখ এসে জড়ো হলো, ভুলে গেলাম।.... আজকাল মাঝেমাঝে এরকম হয়। কি এক শূন্যতা বোধ বুকে

জড়ো হয়, মনে হয় কি যেন নেই! তাইতো, আমি সেই শিউলি গাছের কাছে যাবো ভেবেছিলাম।

সে পূবে হাঁটা শুরু করল। কেউ কোথাও নেই বললেই হয়। ক্বচিৎ দু একজন প্রৌঢ় নরনারী। ছোট্ট একটি মেয়ের হাত ধরে এক বৃদ্ধ, তিনি পরিচিতের হাসি হাসলেন, শিশুটিও হাত নাড়ল।

সকালে বেড়াতে বেরোনো তার ইদানিংকার এক নতুন অভ্যাস। রোজ বেরোয় না, মাঝে মাঝে। যেদিন খুব সকালে ঘুম ভাঙে আর মন ভাল হয়ে যায় সেদিন শুধু। কিন্তু যেদিন বের হয় সেদিনই এদের সঙ্গে দেখা হয়। অর্থাৎ এরা রোজই বেড়াতে আসে। এদের সাথে তার আলাপ নেই, অথচ দৃষ্টি বিনিময় আর হাসি মুখের মিষ্টি পরিচয় আছে। কোনো মানুষের সাথে আলাপ করে উঠতে সে অপটু। বিশেষ ইচ্ছাও করে না। এদের সাথে কি ভাবে যে এমন পরিচয় হয়েছিল! শিশুটিই প্রথম একদিন হেসেছিল আর হাত নেড়েছিল, এভাবে সে কেমন এক ভাললাগায় জড়িয়ে গেছে। সেই শিউলি, বকুল কিংবা যুঁই ফুলের গাছেদের সঙ্গে ভাললাগার সম্পর্কের মতো।

ইদানিংকার এই নতুন অভ্যাস - এই প্রাতঃভ্রমন তাকে অনেক কিছু দিয়েছে। বেড়াতে বেরিয়ে সে গাছগাছালি দেখে, বাগানের ফুল দেখে, লেকের ধারে জলের খুব কাছে বসলে জলের নীচে জলজ উদ্ভিদ আর মাছেদের সাবলীল চলাফেরা দেখে।

এভাবে গাছগাছালি দেখতে দেখতে সে আবিস্কার করছে এই সব ফুলবাহারী গাছেদের। একটা বকুল, একটা শিউলী, একটা যুঁই, এমনকি নৌকা বাইচ ক্লাবের যে বাড়িটা তার পিছনে কিছু ঝোপঝাড়, আশ্চর্য সেই ঝোপঝাড়ে দিব্যি বড় হয়ে আছে ফুলে ফুলে ভরা এক স্থলপদ্মের গাছ! এ গাছটি সে চিনত না। অবশ্য কটা গাছই বা সে চেনে! মালীকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল।

.... মানুষেরই দেওয়া নাম পদ্ম, আবার স্থলের জন্য ভালবেসে আরেকটি ফুলের নাম দিলো স্থলপদ্ম!

এখন সে লেকের ওপর দোলনা ব্রীজের কাছে সেই শিউলি ফুল কুড়োনার

জন্য হাঁটছিল। কমলা রঙের বোঁটার সাদা পাপড়ি সেই ছোট ছোট ফুলগুলি তাদের আশ্চর্য সুগন্ধ নিয়ে তাকে টানছিল। সহসা কি ভেবে সে থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরল। শিশু ও বৃদ্ধ অনেকটা এগিয়ে গেছেন, শিশুটি হাত নেড়ে নেড়ে কি যেন বলছিল আর বৃদ্ধ ঘাড় নাড়ছিলেন, সে অপলক তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর আবার ফিরে হাঁটতে শুরু করল।

....আমি ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছি। বিভৎস রাত্রিগুলির আক্রমণ আর আমার মানসিক অধঃপতন জীবন বিষময় করে তুলছিল।

অফিসে আসতে তার একটু দেরি হয়ে গেল। সকালে বেড়িয়ে ফিরে সে শিউলিদের সাথে মোহগ্রস্ত ছিল অনেকক্ষণ, আর আধখানা গড়া বইয়ের চরিত্ররা তাদের কথাবার্তা ও অনুভূতি দিয়ে তাকে তীব্র টানছিল, তাই সে বইটি বার করে ডুবে গেল ও স্বস্তি বোধ করল।

এভাবে সাধুদা একসময় চা খাবার নিয়ে এসে খাওয়ার কথা বললে সে হাতের ইসারায় জানাল মুখটুক ধোওয়া হয়নি ওসব নিয়ে যাও। এরপর একসময় সাধুদা এসে জানাল অফিসের গাড়ি হর্ণ দিচ্ছে তাই সে নীচে যাচ্ছে বলে দিতে দাদাবাবু আজ অফিস যাবেনা।

- সে কি, গাড়ি এসে গেল? - তাড়াতাড়ি উঠল, একটু ভাবল, বলল ঠিক আছে, বলে এসো - অফিস যাবো না বলার দরকার নেই, বল এখন যাবো না।

তাড়াতাড়ি উঠল সে - ইস্! আজ ব্যায়াম করা হলো না, দাড়ি কামাতে হবে,স্নান

বিষময় রাত্রিগুলি এবং তার মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সে প্রাণপণে কিচু অবলম্বন খুঁজছিল। অবশেষে প্রতিষেধক হিসাবে সে রোজ সকালে ও সন্ধ্যায় ব্যায়াম করে। খালি হাতে ব্যায়াম ও আসন। মানসিক যন্ত্রণায় অস্থির ও অসহায় এক রাতে তার মনে পড়েছিল পুরোনো একটা অভ্যাসের কথা। স্কুল জীবনে ছাত্রাবাসে থাকার সময় অধ্যক্ষ শিখিয়েছিলেন ব্যায়াম আসন। তিনি বলতেন শুধু সুস্থ সবল শরীরই নয় মানদিক শক্তি ও সংযমের জন্য আসন খুব কার্যকরী। তাই সে গভীর মনোযোগে শুরু করেছে শরীর চর্চা

ও প্রাতঃভ্রমণ।

আধঘন্টা পরে সে নামল।অনেক দেরী হয়ে গেছে। একটা ট্যাক্সি খুঁজল, কিন্তু এখন এই সময়ে এখানে ট্যাক্সি পাওয়া প্রায় অসম্ভব। এদিক ওদিক তাকিয়ে রাস্তা পার হলো সে। এখান দিয়ে একটা মাত্র সরকারি বাস যাতায়াত করে, সেটা কখন আসবে ঠিক নেই। যদিও আসে তাতে কি উঠতে পারবে? এমন একটা জায়গায় ফ্ল্যাট দিয়েছে কোম্পানী! অবশ্য গাড়ির ব্যবস্থাও করেছে। কিন্তু -। ....এর চেয়ে যখন ওয়াই. এম. সি. এর হোষ্টেল এ থাকতাম তখনই ছিল ভাল। দিব্যি হেঁটে পাঁচ মিনিটে অফিস চলে যেতাম। অত সময়ের কড়াকড়ির বালাই ছিল না। কিন্তু এই পদোন্নতি, এই ষ্ট্যাটাস - জীবন ক্রমশঃ - একটা মিনিবাস, হাত দেখাল সে। গাড়ি থামল, উঠে পড়ল। ওই একটা আসন খালি - জানলার ধারে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক - বসল এবং বসা মাত্রই অস্বস্তি। সামনে ডানদিকের আসনে এক যুবতী, সে বাঁ হাতে সামনের সীটের মাথার হাতল ধরে আছে। তার উদ্ধত বুকের একপাশ, খাটো ব্লাউস, অনাবৃত তলপেট মাখনের মতো রঙ - সে বিরক্ত হয়ে উঠল।

... তুমি দেখছ কেন নীলাংশু? বাস এত জোরে ছুটছে, মেয়েটি হাতল না ধরে পারবে কেন?

.... নিশ্চয় ধরবে, কিন্তু ও যদি বাহুর ওপর দিয়ে আঁচল বিছিয়ে দিতো তাহলেই দৃশ্য শোভন হয়ে যেত।

.... তাতে কি, খেয়াল নেই যে এভাবে তার শরীরের দিকে অপরের চোখ পড়ছে। .... না, ও ইচ্ছা করে এরকম বসেছে। দৃষ্টি আকর্ষণ আর লোভী করে তোলার জন্যই এ খেলা। এটা একটা উপভোগ। পুরুষের দুর্বলতা দেখে এক ধরনের উল্লাস অনুভব করা। এটাই স্বভাব।শরীর দেখানো এবং উত্তেজিত করার মধ্যে একধরণের সুখ পাচ্ছে। এভাবে পুরুষ অতি ধীরে নারীর কুক্ষিগত হয়ে যায়....কায়মনোবাক্যে পালন করে তার ইচ্ছা অনিচ্ছার .... কিন্তু লজ্জা কথাটা কি একমাত্র নারীর ক্ষেত্রেই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত নয়? নারী মানেই তো যেন লজ্জা!....ভুল, এটা আবরণ মাত্র। লজ্জার ছলে আকর্ষণকে আরও তীব্র

করার প্রয়াস।... আমি জানি,সুযোগ সুবিধা মতো পছন্দসই ব্যক্তি বিশেষকে চরম দুর্বল আর কাবু করার জন্য শরীরের সব আবরণ একটু একটু করে সরিয়ে ফেলতে তাদের কোনো সঙ্কোচ নেই।

এইতো, মেয়েটি আড়চোখে দেখে নিল তার অস্ত্র টিকঠাক প্রয়োগ হচ্ছে কি না।... হ্যাঁ হ্যাঁ মহাশয়া আমি দেখছি। শুধু আমি কেন, আরও অনেকে রুদ্ধশ্বাসে দেখছে তোমার উদ্ধত যৌবন। হে নারী, তুমি নিশ্চিন্তে সুখী হয়ে যাও দর্শকেরা যথেষ্ট দুর্বল হয়ে যাচ্ছে।

....কিন্তু আমি একটুও বিচলিত নই। কারন আমি যে জানি প্রকৃত অর্থ। হ্যাঁ, কিছুদিনের জন্য হিরন্ময় আমাকে এরকম অনুভবের মধ্যে ক্রমশ ঠেলে দিতে পেরেছিল, আমি খুবই দুর্বল হয়ে যেতাম। এরকম পরিস্থিতিতে আমার পা বেয়ে উঠে আসতো জ্বালাময় বিদ্যুৎ। অনেক কিছু ছিঁড়ে ফেলার বাসনা, একটা তীব্র ক্ষুধা... ....হ্যাঁ হ্যাঁ মহাশয়া, আমি বুঝতে পারছি বাসের হঠাৎ ঝাঁকুনির সঙ্গে আপনি আরও বেশি দোলায়িত হচ্ছেন...

.... কিন্তু নীলাংশু এভাবেই তো পৃথিবী চলছে। পুরুষ জীবনে বরণ করে নিচ্ছে নারীকে।

....কিন্তু আমি পারি না। এভাবে এক নারীকে গ্রাস করতে দিতে পারিনা আমার সমস্ত সত্তা। বিসর্জন দিতে পারিনা নিজেকে।

বাস থেমেছে। কয়েকজন নামছেন। মেয়েটি একপলক তাকাল, এভাবে গায়ে আঁচল চাপা দিলো যেন অপরের এই হ্যাংলা দৃষ্টি গায়ে বাজছে, তারপর উঠে দাঁড়াল। নামছে। মনে মনে সে খুব হাসল সে। নিজেকে অবিচলিত রাখতে পেরে তৃপ্তি বোধ করল।

আরেকটা ব্যাপার বিষাক্ত কাঁটার মতে উঁচিয়ে আছে - ওই ব্যাপারটা – পি, এ. - ও ব্যাপারে কি যে করা যায়! একটা সমাধান মাথায় এসেছে -

অফিসে এসেই ফোন তুলল সে, ইন্টারন্যাল টেলিফোনে খুব ধীরে তিনটি নম্বর ঘোরালো। - গুড মর্নিং স্যার, নীলাংশু বলছি।

- হ্যাল্লো! গুড মর্নিং! আরে ব্যাপারটা কি? তুমি কি আজকাল মাঠে ময়দানে

গাছতলায় ঘুরে বেড়াচ্ছ না কি? গতকাল আমি রেসকোর্সে যাচ্ছিলাম, তা ময়দানের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় গাড়িটা দাঁড় করিয়ে সিগারেট ধরাচ্ছি হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল মাঠের মধ্যে একটা গাছের নীচে হেলান দিয়ে তুমি আধশোয়া?

- আপনি ঠিকই দেখেছেন।

- বলো কি হে? তুমি কি আজকাল ছুটির দিনেগাছতলায় শুয়ে কাটাচ্ছ না কি? কিন্তু সঙ্গে গার্লফ্রেন্ড কেউ ছিল বলে তো মনে হলো না।

- আজ্ঞে না, আমি বই পড়ছিলাম।

- কি আশ্চর্য!

- আশ্চর্যের কি আছে? এটা কি কাল?

- কাল? তার মানে? তুমি কি কলিকালটাল সম্পর্কে বলছ?

- আজ্ঞে না, আমি বলতে চাইছি এটা কি ঋতু?

- ঋতু? তা কি করে জানবো? তবে এটা সেপ্টেম্বর মাস, এটুকু বলতে পারি শীত আসতে এখনও দেরি আছে।

সে চুপচাপ। থমথমে ফোনের লাইন।

- কি, কথা বলছ না কেন?

- এটা শরত কাল, আকাশটা খুবই নীল, ময়দানে ঘাসেরা খুবই সবুজ হয়ে আছে। এরকম সময়ে ঐভাবে একটা দিন সারাটা দুপুর কাটাতে আমার খুবই ভাল লাগে।

- তা হয়েছেটা কি তোমার? ভাল লাগার কথার মধ্যে একটুও ভাললাগা নেই তো। কথাগুলো বললে যেন ময়দানে বক্তৃতা দেওয়ার মতো! যাক, তারপর কি করলে বলো।

সে একটু নরম হয়ে গেল। মনের মধ্যে বাঁকা ভাবটা জেগে উঠেছিল। বলল - তারপর যখন সূর্য ডুবে যাচ্ছিল তকন হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার ধারে গেলাম, কয়েকটি বড় বড় জাহাজ বিশ্রাম করছে - তাদের সঙ্গে - ঢোক গিলে বাকি কথাটা ভেতরেই রেখে দিল - বলতে যাচ্ছিল - কত দীর্ঘ বিক্ষুব্ধ পথ পার হয়ে এসেছে সেসব কথা - কিন্তু চুপ করে গেল। এসব আবেগের কথা শুনিয়ে

বিদ্রুপের হাসি উপহার পাওয়া যেত এক্ষুনি।

- তারপর কি করলে?

- তারপর খিদে পাচ্ছিল, ঝালমুড়ি খেলাম, ফুচকা খেলাম, চা খেলাম।

- তোমার জীবনে কিচ্ছু হবেনা, বুঝেছ? কেন যে তোমার বাবা তোমার ভবিষ্যতের জন্য আমাকে দায়ীত্ব দিয়েছেন! ছুটির দিনে তুমি ক্লাবে যাবে, সুইমিং পুলে, রেসকোর্সে, সেখানে ডাইরেকটর এবং তাঁদের স্ত্রীদের সঙ্গে মেশামিশি করবে। নাঃ, তোমাকে বুঝিয়ে লাভ নেই। তোমার কত সুযোগ!একজন হ্যান্ডসাম ইয়ং ব্যাচেলর, তুমি কি না উজবুকের মতো নীল আকাশ, ময়দানে ঘাস গোনা, ফুচকা, এইসবকরে বেড়াচ্ছ।

তার মাথার মধ্যে রক্তেরচাপ। স্নায়ুগুলি দপদপ করছিল। - আপনি একটা অযোগ্য ছেলেকে ভুল করে সুযোগ দিয়েছেন - সে কর্কশ গলায় বলল - বাবাও আপনাকে অনুরোধ করে ভুল করেছেন।

- বাঃ! তোমার বাবা আর আমার সম্বন্ধে তুমি তো খুব সুন্দর মন্তব্য করে ফেললে! শোনো, তুমি খুব অন্যায় কথা বলেছ - তিনি গম্ভীর গলায় বললেন - আমি কি ভুল করেছি না করেছি সে সম্পর্কে তোমার মন্তব্য বেয়াদপী। আর তোমার বাবা সম্বন্ধে তুমি যেভাবে কথা বলছ সে ব্যাপারে আমি কিছু বলতে চাই না, ওকে লিখেই জানাব। টাটানগর থেকে একটা চিঠি এসে কদিন হলো পড়ে আছে উত্তর লেখা হয়নি, আজকেই লিখব। যাক, তুমি কেন ফোন করছিলে সেটাই শোনা হয়নি, বল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

- কি হলো? আমি কি ফোন রেখে দেবো?

- একটা অনুরোধ ছিল - সে মিনমিন করে বলল - ওই পি.এ. র ব্যাপারে, আমি কি আমার পি.এ. নিজে বেছে নিতে পারি না?

- তা কি করে সম্ভব? একসঙ্গে ইন্টারভিউ নেবে পার্সোনেল ডিপার্টমেন্ট। রিক্রুটমেন্ট অফিসার রয়েছেন, তিনিই সবকিছু দেখবেন।তবে তোমার চিন্তার কিছুনেই। ফার্স্ট প্রেফারেন্স - বিউটিফুল ফেস এন্ড হ্যান্ডসাম ফিগার, দেন্ উইশ

ইয়োর গুড লাক্ । টেলিফোনে হাসির ঝড় ভেসে এল। শুনতে শুনতে তার কান লাল, সে নাক মুখ কোঁচকাল - রিক্রুটমেন্ট অফিসার - ভাবল সে, ফোনের ডায়াল ঘোরাল - তিনবার।

- হ্যালো, কে? মিস্টার বাসু? আমি মিত্র বলছি - পাবলিসিটি এন্ড পাবলিক রিলেশন -

- আরে কি সৌভাগ্য, বলুন বলুন, আমি নিজেই একবার আপনার কাছে যাব ভাবছিলাম।

- তাই না কি? কি ব্যাপার বলুন তো?

- আর বলবেন না, পাড়ার সার্ব্বর্জনীন দুর্গোৎসব কমিটিতে আমাকে ঢুকিয়েছে। মতলব কে জানতো! এখন বলে কি না একটা বিজ্ঞাপন এনে দিতে হবে। অবশ্য আমাদের এই ভবানীপুরের পুজোটা খুবই বিখ্যাত। বড় বড় কয়েকটি পুজো কে আমাদের কোম্পানির বিজ্ঞাপন বোধহয় দেওয়া হয়েই থাকে। অবশ্যই আপনি যদি একটু দেখেন তাহলে বুড়ো মানুষটার মান রক্ষা হয়।

- আরে ছিঃ ছিঃ! একি বলছেন! আমি নিশ্চয় দেখব। যাক্ আমি যা বলছিলাম -

- হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন।

- বলছিলাম কি, এই যে স্টেনো নেওয়া হবে এ ব্যাপারে কতদূর?

- দরখাস্ত বাছাই হয়ে গেছে, চিঠি দেওয়া শুরু হয়েছে। সামনের মাসের আট তারিখে ইন্টারভিউ।

- বলছিলাম কি আমার একটা ক্যান্ডিডেট আছে।

- আচ্ছা আচ্ছা, নাম ঠিকানা বলুন, লিখে রাখছি।

- না না মিস্টার বাসু, আমি ওরকম সাহায্য চাইছি না, ইন্টারভিউ দিক, স্ট্যান্ডার্ড দেখা যাক, শেষে যদি একটু আধটু আটকায় তখন।

- কিন্তু নাম না জানলে আমি সেটুকুই বা জানাবো কি করে? তাছাড় প্রাথমিক বাছাইয়ের সময় যদি তার দরখাস্তই বাতিল হয়ে যায়? তাহলে?

- তাহলে যাক্।

- সেটা আবার কি কথা হলো? ক্যান্ডিডেট ইন্টারভিউ অন্ততঃ পাওয়া চাইত?

একটু থতমত অবস্থায় চুপচাপ থাকে সে, তারপর - না মিস্টার বাসু, আমি অন্যায় কিছু সুযোগ নিতে চাইছি না, ক্যান্ডিটের যদি যোগ্য হয় একমাত্র সেক্ষেত্রেই -

- আপনি যেরকম চাইবেন। আমি কিন্তু বিকালের দিকে একবার যাচ্ছি।

- বিকালে আমি থাকবোনা, আপনি অন্য একদিন আসুননা, এখনও তো সময় আছে। আচ্ছা রাখছি।

টেলিফোন রেখে সে দুহাত মুঠো করে ঊর্ধ্বে ছুঁড়ল। চাপা উত্তেজনায় তার মুখ রক্তাভ আর ভারী দেখাল।

একগাদা কাগজপত্র নিয়ে ঘরে ঢুকলেন প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক, পরনে ধুতি পাঞ্জাবী। মাথার সামনের দিকে চকচকে টাক। যা চুল আছে তা অধিকাংশই সাদা। মাঝারি চেহারার গোবেচেরা মুখভাব। মুখ ভর্তি পান চেহারাকে আরও খানিকটা ভোঁতা করেছে।

সে করুণ চোখে ভদ্রলোকের দিকে তাকাল, বলল - আসুন সরকারবাবু।

- অনেক লেখাটেখা জমে গেছে - সরকারবাবু লেখার গোছা টেবিলে রাখলেন-

আমাদের বিভিন্ন শাখা অফিস আর সব ফ্যাক্টরিগুলো থেকে এবার বেশি লেখা এসেছে, বিশেষতঃ বম্বে অফিস আর ফ্যাক্টরিগুলি থেকে এবার বেশি লেখা এসেছে। পুজো এসে গেল, পত্রিকা সময় মতো বার করতে গেলে লেখা বাছাই করে ছাপতে দিতে হয়। আজকে রয়াল প্রিন্টার্স এর গুপ্তবাবু ফোন করেছিলেন, জানতে চাইলেন কবে আমরা কাজ পাঠাচ্ছি।

লেখাগুলি সে কাছে টেনে নিল, উল্টেপাল্টে দেখে সে অন্যমনস্ক হয়ে গেল.... আমার চাকুরি জীবনের প্রথম কাজ.... দেখতে দেখতে কতগুলি বছর চলে গেল। দিদিমা সেই যে কথায় কথায় বলে - বছর যাচ্ছে না জল যাচ্ছে! জলের মতোই বয়ে গেল কতগুলি বছর....অথচ এই চাকরির প্রস্তাব যখন এসেছিল তখন যোগ দিতে মন একটুও সায় দেয়নি। নিজেরই মনের মধ্যে বেঁকে দাঁড়িয়েছিল নিজেরই আরেক সত্তা। আমাকে অস্থির আর জেদী করে তুলেছিল। আজ এতদিন পর আবারও কি সেই ভাব আমাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে?

মনে হচ্ছে এই চাকরি যেন অনুগ্রহ....

তার চাকরি জীবনের শুরু যে কাজ দিয়ে -

প্রতি তিনমাস অন্তর কোম্পানি একটি ' হাউস ম্যাগাজিন ' প্রকাশ করবে। এই পত্রিকায় কোম্পানির সকল শ্রেণির কর্মচারীদের লেখা প্রকাশিত হবে। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমন কাহিনী এই সব। অবশ্যই নির্বাচিত লেখা। এছাড়া থাকবে কোম্পানির বিভিন্ন খবর, বক্তব্য, নীতি নির্ধারণ উৎপাদন সম্পর্কিত খবরাখবর ইত্যাদি। তার কাজ হচ্ছে সম্পাদনা করা।

ব্যাপারটা বেশ মনে ধরেছিল তার, আর সেজন্যই সে মনের বাঁকা ভাব দমন করেছিল। কিন্তু শুধু কি তাই? না আরও কিছু? সেই আদেশ - যা অস্বীকার করার সামর্থ তার ছিল না?

ব্যাপারটা ঘটেছিল হঠাৎই। তখন সে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে প্রায় উদ্দেশ্যহীন। হোস্টেল ছেড়ে চলে গেছে ডায়মন্ডহারবারে তার দিদিমার কাছে। যদিও ভবিষ্যৎ কর্মধারা, জীবিকা, অর্থোপার্জন এসব ব্যাপারে চিন্তা আছে, তবু দিন কেটে যায় বিস্তৃত নদী আর ভাঙা কেল্লার সাথে পুরোনো বন্ধুত্বের নিবিড় সান্নিধ্যে মনে মনে কথা বলে। সেই নিরবচ্ছিন্ন ছুটির দিনগুলিতে একদিন টাটানগর থেকে চিঠি এলো। বাবা লিখেছেন তাঁর বন্ধু জনৈক অনন্ত স্যান্যাল মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে। নামের নীচে বন্ধুর পদাধিকার ও ঠিকানা। দ্বিধাগ্রস্ত মনে সে দেখা করতে গিয়েছিল।

অফিসের নিস্তব্ধ চেম্বারে মিস্টার স্যান্যাল সেদিন চুপচাপ কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। দৃষ্টি বড় তীক্ষ। তারপর সংক্ষেপে বলেছিলেন - বোসো। একটি কাগজ এগিয়ে দিয়ে দরখাস্ত লিখতে বলেছিলেন, পদ- এসিস্ট্যান্ট পাবলিসিটি অফিসার।

ঠিক তখন তার বুকের মধ্যে ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে যায় সেই জেদী অশ্ব। এই বেকার সমস্যার যুগে এত সহজে এমন এক চাকরির সুযোগ! এই অনুগ্রহে

- আমি দুএকদিন ভেবে দেখতে চাই - সে বলেছিল।

- ভাবার কিছু নেই - তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর গম্ভীর গলায় বলেছিলেন তিনি - দিজ ইজ

মাই অর্ডার, এন্ড ইউ উইল জয়েন উইদিন সেভেন ডেজ।

- কিন্তু আমি কলকাতায় থাকি না, থাকি ডায়মন্ডহারবারে, অতদূর থেকে -

- কয়েক দিন কষ্ট করে চালিয়ে নাও, আর কলকাতায় থাকার একটা ব্যবস্থা করো। বেটার ইউ কন্টাক্ট উইথ ওয়াই. এম. সি. এ. হোস্টেল। আই মে হেল্প ইউ - বলতে বলতে টেলিফোন তুলে অপারেটরকে নির্দেশ - ওয়াই. এম. সি. এ. - র লাইন প্লিজ - তারপর - নাউ আই শ্যাল থ্রো সাম লাইট অন ইয়োর জব - সারা ভারতে অনেক বড় বড় ব্যাবসায়িক সংস্থা - না, সারা পৃথিবীর সব দেশেরই বড় বড় ব্যাবসায়িক সংস্থাগুলি হাউস ম্যাগাজিন প্রকাশ করে - গদি মোড়া বিশাল চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে গম্ভীর অথচ মৃদু কণ্ঠস্বরে তিনি শুরু করেছিলেন তাঁর ব্যাখ্যা - শেষ করেছিলেন এভাবে - আমি তোমাকে হাত ধরে এনে বসিয়ে দিচ্ছি ওই চেয়ারে। আমি শুনেছি সাহিত্যের পড়াশোনা তোমার ভালই আর ইংরাজি ভাষায় তোমার জ্ঞান ও দক্ষতা যথেষ্ট। তাছারা ইংরাজি সাহিত্যে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি তো তোমার রয়েইছে। এসব জেনেই আমি তোমাকে এই দায়ীত্বটা দিচ্ছি, শুধুমাত্র বন্ধুর কথায় নয়। কাজটা বেশ কঠিন। এ পত্রিকায় যা কিছু ছাপা হবে সবই প্রায় কাঁচা হাতের লেখা। কিন্তু যেহেতু পত্রিকা প্রকাশ হবে ইংরেজিতে সেহেতু লেখাগুলি ইংরেজিতে অনুবাদের মাধ্যমে তুমি অনেকটা উন্নত করার সুযোগ পাবে। তবে এটা মনে রাখতে হবে ভাষা হবে সহজ সরল, সকলের বোধগম্য। কিন্তু শুধু লেখাজোখাই সব নয়, বুদ্ধি আর দক্ষতা দিয়ে তোমাকে অনেক কিছু শিখে নিতে হবে। সব কিছুর ওপর সাজিয়ে তুলতে হবে একটা শিল্পসুলভ সৌন্দর্য যেটা এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় জিনিস। এজন্য তোমাকে অনেক দেশী বিদেশী পত্রিকা পড়তে হবে, খুঁটিয়ে দেখতে হবে তাদের সাজানে গোছানোর পদ্ধতি, রঙের কারুকার্য, ছাপার বৈশিষ্ঠ্য। কলকাতার কয়েকটি দক্ষ ছাপার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমি তোমার যোগাযোগ করিয়ে দেবো। তাছাড়া আমাদের আর্টিস্টরা তো আছেনই। কিন্তু সবকিছুর ওপর আমি দেখতে চাই তুমি খুব তাড়াতাড়ি নিজেকে তৈরি করে নিয়েছ। এ ব্যাপারে আমার সম্মান রক্ষার দায়িত্ব আমি তোমার হাতে তুলে দিলাম। তাঁর কণ্ঠস্বরের রেশ অনেকক্ষণ

যেন সেই ঘরে অনুরণিত, তারপর - একন চলো, তোমাকে পাবলিসিটি এন্ড পাবলিক রিলেশন ডিপার্টমেন্টের প্রধান মিস্টার সেন এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। ওনার অধীনেই তুমি যোগ দেবে। উনি তোমাকে আরও অনেক কিছু বুঝিয়ে দিতে পারবেন।

বিনা প্রতিবাদে বাধ্য ছেলের মতো পিছু পিছু তাকে উঠে যেতে হয়েছিল। ....ওই আদেশের ঔদ্ধত্যকে আমি আজও অস্বীকার করে চলে যেতে পারলাম না....আমার যত তর্জন গর্জন সব মনে মনে...

অবশ্যই আমি কর্মকুশলতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি। আমার তো মনে হয় উনি যা আশা করেছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশিই পেরেছি।
(সামনের দেওয়ালের দিকে তাকাল সে, সেখানে সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো কয়েকটি সার্টিফিকেট ও পদক) সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় আমাদের সংস্থা এই পত্রিকার জন্য বেশ কয়েকবার প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। এখন আমি আমার কর্মকুশলতায় এই সংস্থার একজন অবশ্য প্রয়োজনীয় মানুষ। শুধু কারো অনুগ্রহের পাত্র এক অযোগ্য অকর্মণ্য নয়। এর জন্য আমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে, অনেক পড়াশোনা - ওনার সম্মান আমি রেখেছি।

.... কিন্তু বদলে উনি আমাকে সবসময় হেয় করে কথা বলতে পারলেই খুশি হন। অর্থাৎ কি না এটাই আমাকে বুঝিয়ে দিতে চান - ওই চেয়ারে আমি তোমাকে বসিয়ে দিয়েছি!
....কিন্তু এটা তো সত্যি তুমি এসব পেরেছ শুধু তোমাকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে বলেই, তাই নয় কি? তোমার চেয়েও অনেক যোগ্য মানুষ আছে যারা এমন সুযোগ পেলে তোমার চেয়েও ভাল কাজ দেখাবে!
- ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাই! আঃ! সেদিনের সেই কথাটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না - 'এর মানে তুমি নিজেকে অকর্মণ্য বলতে চাইছ। অর্থাৎ কি না তোমার সব কাজ তুমি নিজে করতে পারো না।' শেষে আবার হুল - ' বাঃ তাহলে তো তোমাকে চাকরিতে রাখা চলে না! '....রেখো না, চাকরিতে আমাকে রেখো না! এর চেয়ে অনেক ভাল স্কুলের চাকরি, বা টুইশনি করে চালানো।

ভাল লাগে না, কিছু ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে নিজেকে এত ক্লান্ত মনে হয় –

ভাবতে ভাবতে সে কেমন বিষন্ন হয়ে গেল। অন্য মনে লেখার ফাইল ঘাঁটল, কাগজ ওল্টাল, কিন্তু কিছুই পড়ে উঠতে পারল না।

পাঁচ

দরজার দুটো পাল্লা দুটো বিরাট কাচ দিয়ে তৈরি। ভেতর থেকে ওপারে রাস্তার ছুটন্ত যানবাহন গতিশীল মানুষজন ইত্যাদি নির্বাক ও শব্দহীন চলচ্চিত্রের মতো দেখায়। শুধুমাত্র কেউ দরজা খুলে ঢুকলে কিছু শব্দ অনুপ্রবেশকারীর মতো ঢুকে পড়ে পুণরায় নৈশব্দ।

এটা রিসেপশন কাউন্টার। এগারতলা এই হেড অফিস ও সেলস অফিসের একতলায় রিসেপশন কাউন্টারে সে আজকে উপস্থিত - সে নীলাংশু মিত্র, প্রচার ও জনসংযোগ বিভাগের প্রধান। সে আজ রিসেপশনিস্ট মিস্ সোমা হালদার ও মিস্ ভারতী সাকসেনাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করছিল, কারন -

কারন তার পত্রিকা। তার চাকরির শুরু এই পত্রিকা দিয়েই। তারপর অবশ্য তার কাজের পরিধি অনেক বিস্তৃত হয়েছে। সহকারী পদ থেকে সে উঠে এসেছে প্রধানের পদে। এখন সে নানান কাজের দায়িত্বে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু এখনও সে সবচেয়ে গুরুত্ব দেয় তার সেই প্রথম কাজটির ওপর। লেখায় রেখায় ছবিতে রঙে তার পত্রিকাটিকে সে মনের মতো করে সাজিয়ে তোলে। দিনে দিনে সাজিয়ে তুলতে তুলতে সে এটাকে অতুলনীয় করে তুলেছে।

ইদানিং বেশ কয়েকটি সংখ্যায় সে একটি বিশেষ রচনা রাখছিল - বিচিত্র কর্মী। এই রচনায় সে যে কোনো একজন বিশেষ কর্মী ও তার কাজ নিয়ে সাজিয়ে তুলছিল আকর্ষনীয় একটি রচনা। এবারের সংখ্যায় সে হঠাৎ ঠিক করেছে ' রিসেপশনিস্ট '। গতকাল বিকালের দিকে সে তার ইচ্ছার কথা দুজন রিসেপশনিস্ট কে জানিয়েছিল। বলেছিল আগামীকাল আমি নিজে উপস্থিত থেকে আপনাদের কাজ সম্পর্কে কিছু তথ্য নেবো। আশা করি আপনারা

আমাকে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন।

আজ আট তারিখ। আজ স্টেনোগ্রাফার-কাম্- পি. এ. দের ইন্টারভিউ। এখন সকাল দশটা। মাঝে কাচের দরজা ঠেলে এক একটি মেয়ে ঢুকছিল, তাদের পিছন পিছন ঢুকে পড়ছিল রাস্তার শব্দ, আর সে তখনই দেখে নিচ্ছিল প্রবেশকারিনীকে।

প্রবেশকারিনী স্বাভাবিক নিয়মে চলে আসছিল রিসেপশন কাউন্টারে, ব্যাগ খুলে ইন্টারভিউয়ে চিঠি বার করছিল, মিস হালদার সেটি নিচ্ছিলেন ও জমা রাখছিলেন তারপর পাশের হলঘরে তাকে অপেক্ষা করতে বলছিলেন। হলঘর ক্রমশঃ ভরে উঠছে, মেয়েদের হালকা কলরব এখানে ভেসে আসছিল।

- আমাদের কি সৌভাগ্য মিস্টার মিত্র! - আধো আধো গলায় বললেন মিস্ হালদার - এতদিন ধরে আমাদের ম্যাগাজিনে ' বিচিত্র কর্মী ' লেখায় সবই দেখি পুরুষ। আমরা কিছু মেয়েরাও যে এই কোম্পানিতে চাকরি করি সেকথা আপনি ভুলেই গিয়েছিলেন। যাই হোক, অবশেষে মেয়েদের কথা যে আপনার মনে পড়ল সে আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে। আমাদের সকলের মনেই তো ক্ষোভ ছিল যে মিস্টার মিত্র কোনো মেয়েকে চান্স দিচ্ছেন না।

- এখন নিশ্চয় আপনার মনে কোনো ক্ষোভ থাকবে না বা মিস্টার মিত্রকে মনে মনে গালাগালি দেবেন না - হাসি হাসি মুখে বলল সে। (আঃ, মহাশয়া জানেন না তো কি ঝামেলায় পড়েছি! নাহলে কি আর এই ন্যাকামি সহ্য করতে এসেছি!)

- ছিঃ ছিঃ, গালাগালি বলছেন কেন? - মিস হালদার ছোট্ট করে জিভ কাটলেন - আমি কি তাই বললাম? - অভিমানে তাঁর কন্ঠস্বর ভারী - শুনেছি মহিলাদের সম্পর্কে আপনার নাকি অশ্রদ্ধা আর বিদ্বেষ আছে, তাই আপনি সুযোগ দেন না - এরকমই আমরা বলাবলি করতাম, তাই বলে গালাগালি নয়।

সে আবার হাসি হাসি মুখে - আচ্ছা মিস্ হালদার, এখন আমার সঙ্গে মিশে কি আপনার তাই মনে হচ্ছে?

- মোটেই না, বরং খুব ভাল লাগছে, তাই না ভারতী? - মিস্ হালদার

সাক্ষী মানেন মিস্ সাকসেনাকে।

ভারতী সাকসেনার হাসি দেখতে দেখতে দরজা খুলে ঢুকে পড়ে রাস্তার ছুটন্ত গাড়ির হর্ণের শব্দ - সে দ্রুত চোখ ফেরায় - না কোনো মহিলা নয়, সাঙ্গোপাঙ্গ সহ নানান যন্ত্রপাতি আর ক্যামেরা নিয়ে ঢুকছেন ফটোগ্রাফার।

- গুড মর্নিং মিস্টার রায়, আপনি এসে গেছেন, আপনার প্রথম ছবিটি এখানেই তুলবার ব্যবস্থা করুন - এই রিসেপশান কাউন্টারে, মিস্ হালদার আর মিস্ সাকসেনাকে তুলে নিন।

- পিকচার অলসো? আ লাভলি! - মিস্ সাকসেনা দুহাতে তালি দিয়ে ছোট্ট মেয়ের মতো আহ্লাদী।

(আহা! আহ্লাদী মেয়ের সূক্ষ আঁচলের নীচে দুলে ওঠে মোহ! মোহ ছড়াচ্ছ মোহময়ী!)

....বুকের মধ্যে গর্জন। আমি পড়ে যাচ্ছি কোনো এক বিশাল খাদের মধ্যে। চতুর্দিকে পাহাড় পাহাড়। দীর্ঘ দেহ গাছেদের ওলট পালট....তোমাকে কি ভীষণ ঘৃণা করছি ভারতী!

তখন কাঁচের পাল্লা দোলে। বাইরের রাস্তার বিচিত্র শব্দাবলী কয়েক মুহূর্ত জুড়ে সচকিত, পুণরায় সুনসান। সে চোখ তুলে দেখল - একটি মেয়ে ঢুকছে - এগিয়ে আসছে। সহসা তার দৃষ্টি প্রখর, সে মেয়েটিকে খুঁটিয়ে দেখে - কি ভীষণ শীর্ণকায়া। রঙ কাগজের মতো ফ্যাকাসে। মাথার চুল টেনেটুনে আঁচড়ে গার্ডার লাগানো যা ঘাড়ের নীচে নামেনি। শীর্ণ গালে চোয়ালের হাড়ের আভাস। চোখ দুটি বসা। সস্তা ছিটের একটা স্কার্ট পরনে।

পোযাকের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে দৃষ্টি নীচের দিকে নামাল সে - বকের ঠ্যাং এর মতো পা, পায়ে জীর্ণ চটি। মেয়েটি খুবই ভীতু ভীতু চোখে সকলের দিকে তাকাল, ফটোগ্রাফার, ক্যামেরা, লাইট, এত সব যন্ত্রপাতি - এসব দেখে মেয়েটি মনে হলো ঘাবড়ে গেছে।

- হ্যাভ ইউ কাম ফর ইন্টারভিউ? - সে আগবাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল।

মেয়েটি তার দিকে তাকাল, ভীতু গলায় বলল - ইয়েস স্যার।

- গিভ ইয়োর লেটার প্লিজ –

মেয়েটি হাত ব্যাগ খুলল, সে দেখল তার শীর্ণ হাত, হাড়ের ওপর চামড়া ছাড়া মাঝখানে আছে সবুজ শিরা উপশিরা শেকড়ের মতো। মেয়েটি চিঠি এগিয়ে দিলো, সে হাত বাড়িয়ে নিলো, বলল - গো এন্ড ওয়েট দেয়ার - হাত তুলে পাশের হলঘর দেখিয়ে দিলো। মেয়েটি আবারও ভীতু ভীতু চোখে সকলকে একবার দেখল তারপর এগিয়ে গেল।

দ্রুত চিঠিতে চোখ বোলাল সে - মেয়েটির নাম মার্সিয়া বিশ্বাস। চটপট সে চিঠিটা মিস হালদারের দিকে এগিয়ে দিল, বলল - মিস্ হালদার, চিঠির গোছাটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে ফেলুন, ছবি তোলা হয়ে যাক, আপনাদের আর বেশীক্ষণ জ্বালাতন না করাই ভাল।

- কি যে বলেন মিস্টার মিত্র, আপনি আমাদের সারাদিন জ্বালাতন করতে পারেন।

- (আহারে! চোখ যেন মন্ত্রমুগ্ধ হরিণী!) মিস্টার রায়,

পছন্দ মতে তিনটে স্ন্যাপ নিন, আমি আমার ঘরে আছি, ছবি তুলে ওখানে চলে আসবেন - বলতে বলতে সে দ্রুত হেঁটে যায়।

....অবশ্য আমি ঠিক এতটা ভাবিনি। আমি এরকম একটা চেহারা ভেবে রেখেছিলাম - খুবই বাজে দেখতে আর ময়লা রঙ আর বয়স্কা। তা এ যা পাওয়া গেল আমার কল্পনার চেয়েও বেশি, একেবারে পাটকাঠির টুকরো। তার ওপর আবার খটখটে স্কার্ট! বাঃ ভাই বাঃ! বেশ বেশ!...

সে দ্রুত পায়ে চলে এলো তার চেম্বারে, ফোন তুলল, তিনটে নম্বর ঘোরালো।

- হ্যালো, কে? মিস্টার বাসু? আজকে আপনার স্টেনোগ্রাফারদের ইন্টারভিউ না? আচ্ছা, আমার কথা মনে আছে তো? শুনুন, আমার ক্যান্ডিডেটের নাম মার্সিয়া বিশ্বাস। হ্যাঁ এংলো ইন্ডিয়ান মেয়ে। ব্যাপারটা কি জানেন ওর দাদা আমার সাথে পড়ত। ব্যাপারটা খুবইদুঃখজনক, ওদের বাবা খুবই অসুস্থ, মানে শয্যাশায়ী, আমার সঙ্গে অনেককাল যোগাযোগ ছিলনা, হটাৎ যোগাযোগ, বন্ধুর

চাকরিবাকরি নেই, আমাদের বিজ্ঞাপন দেখেছে তাই যোগাযোগ করেছে। এই আরকি। বোনের চাকরিটা হলে ফ্যামিলিটা বেঁচে যায়। মিস্টার বাসু, আপনি অবশ্য একটু দেখবেন। অবশ্যই মেয়েটি কাজ ভালই জানে। তবে কি না দেখতে ভাল নয়, আর খুবই রোগা। মানে হ্যান্ডসাম ইয়ং বিউটিফুল সব লেডি নেওয়া হবে তো। অবশ্য আপনার অসুবিধা এই জীর্ণ শীর্ণ মেয়েটিকে কার অফিসে বসাবেন। যার কাছেই দিন পছন্দ হবে না। আর কথাও উঠতে পারে যে এ চান্স পেল কি করে? সে ব্যাপারে আপনাকে জানাচ্ছি ওকে আমার অফিসেই দেবেন, কেমন? সবশেষে বলি মিস্টার বাসু, ব্যাপারটা গোপন রাখবেন, কেমন? আশা করি আপনি আমার জন্যে এটুকু করবেন। আমার এক দুস্থ বন্ধুর জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। হ্যাঁ, মেয়েটির নাম - মার্সিয়া বিশ্বাস। ফোন রেখে সে চেয়ারে হেলান দিলো। দীর্ঘ টানে বাতাস ভরে নিল বুকে। এ সুযোগ ছাড়লে চলবে না। মিস্টার বাসুর কাছে নিজে গিয়ে আরও ভেজাতে হবে। আর হ্যাঁ, ওনাকে একটা ভাল বিজ্ঞাপন দিতে হবে, একেবারে ব্যাক কভারের পুরো পাতা! মনের আনন্দে ক্যাঁ-ক করে লম্বা কলিংবেল বাজাল, বেয়ারা ঢুকল।

- চা, আর হ্যাঁ, ওঘর থেকে সরকারবাবুকে একবার ডেকে দাও।

হা হা হি হি হো হো! খেলা খুব ভালই জমেছে! এবার সরকারবাবুর ব্যবস্থা।

সরকারবাবু ঢুকলেন - বলুন -

- বসুন। (একটু চুপচাপ) দেখুন, আপনি অনেকদিন এ ডিপার্টমেন্টে আছেন, আপনার কাজ যদিও ডিকটেশান নেওয়া আর টাইপ করা, তবুও আপনি ধীরেধীরে অন্যান্য কাজ এত বেশী ঘাড়ে নিয়ে নিয়েছেন যে ওই কাজটাই গৌন হয়ে গেছে। আমি কিছুদিন ধরে ভাবছিলাম আপনার সম্বন্ধে ওপরে লিখব। আপনাকে যদি জুনিয়র অফিসার পদে প্রমোশনের জন্য লিখি - অবশ্য হবে কি না জানি না, কিন্তু চেষ্টা করব ভাবছি। আপনার আপত্তি নেই তো?

- বেশত আছি, ওসবের আর কি দরকার - সরকারবাবু বিনয়ী।

- কি বলছেন সরকারবাবু? না না, আপনি আপত্তি করবেন না, অন্ততঃ আমাকে

চেষ্টা করতে দিন। এখনও আপনার বছর আটেক চাকরি আছে।

সরকারবাবু - দেখুন -

- ঠিক আছে, আসুন -

পরম মেজাজে সিগারেট ধরাল সে। ' ঘোড়াগুলো বাঘের মতো খেলছে ' - কবিতার লাইন আওড়ালো - দেখি দাবার খেলায় কে জেতে!

ছয়

বিষন্নতা যেন এক রুক্ষ মরুঝড়....বৃক্ষের আন্দোলন নেই, নেই জলোচ্ছাস....ত্রস্ত পখিরা আর্তরবে উড়ে যায়নাকো, কিংবা কলরবে আশ্রয় খোঁজে না দ্রুত শিশু-নর-নারী। বিষন্নতা যেন এক রুক্ষ মরুঝড়, তীব্রবেগ বাতাসের অবয়বে শুধু অতি দ্রুত ছড়িয়ে যায় বালির আস্তর...

বিষন্নতা তাকে এভাবে গ্রাস করে। অজান্তে কখন চারপাশে চুপিসাড়ে জেগে ওঠে মরুভূমি.... বালির পাহাড়, বালির উপত্যকা, বালুময় পথ, আর কিছু নেই... তারপর কখন সে মরুভূমে বাতাস হয়ে ওঠে তীব্র হতে তীব্রতর, হয়ে ওঠে ঝড়, ঢেকে যায় সর্বচরাচর, অসহায় সে দাঁড়িয়ে থাকে অন্ধের মতন, অতি ধীরে তলিয়ে যায় বালুর ভিতর।

কর্মব্যস্ত সময়ের মাঝে কিভাবে যে অনুপ্রবেশ করে বিষন্নতা! বিশেষতঃ সে যখন কোনো দুরুহ কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে দাঁতে দাঁত চেপে এভাবে যেন কব্জির লড়াই - তখন সে এক তীব্র উত্তেজনার মধ্যে সময় অতিবাহিত করে। তারপর যখন আসে জয় - জয়ী সে আনন্দে উদ্ভাসিত হতে চায় তখনই সহসা অনুভবে জেগে ওঠে মরুভূমি - ঝড় - গভীর অবসাদে বুক তার পঙ্গু হয়ে যায়।

কয়েকদিন ধরে তার মনের মধ্যে যে উত্তেজনার টানাপোড়েন চলছিল আজ তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। একটু আগে মিস্টার বাসু এসেছিলেন, চেয়ার

টেনে বসতে বসতে বললেন - আপনার জন্য কিছু করতে পেরে আনন্দ হচ্ছে। অবশ্য আপনার ক্যান্ডিডেট কাজের দিক থেকে খুবই উপযুক্ত। ইন্টারভিউতে সে নিজেই ভালভাবে উতরে গেছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছিল চেহারা নিয়ে। দেখতেই এত অসুস্থ! কিন্তু একস্ট্রা ক্যারিকুলাম - সাহিত্য চর্চা, সে প্রচুর বই পড়তে ভালবাসে। ইংরাজি সাহিত্যে তার অগাধ পড়াশোনা যেটা আপনার কাজে লাগবে মনে হয় - একটু চুপচাপ ভাবেন বাসুবাবু, নিজের মনেই বলেন - আসলে যার রূপ নেই সে অন্য কিছুতেই অবলম্বন খোঁজে! যাই হোক আমি ম্যানেজ করে নিয়েছি। আসলে দরকার তো কাজ! আর সেদিক থেকে ও যখন দক্ষ - অবশ্য আপনি ওকে নিজের কাছে রাখতে চেয়েছেন সেজন্যই আমি পারলাম। আপনার কাছেই ওকে পাঠাবো তো?

- নিশ্চয় নিশ্চয় - সে ব্যস্ত।

- মেয়েটিকে দেখে মনে হয় খুবই দুস্থ - আপন মনে যেন স্বগতোক্তি করেন বাসুবাবু - চাকরিটা ওর ভীষণ দরকার ছিল। এরকম ছেলেমেয়েরা চাকরি পেলে আমার খুব আনন্দ হয়।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মিস্টার বাসুর মুখের দিকে তাকিয়ে সে কথাগুলি শুনছিল - মন অস্থির - কিছু কি জেনে ফেলেছেন উনি? কিছু বুঝতে পারল না সে, শুধু দেখল প্রৌঢ় ভদ্রলোকের মুখমন্ডল সত্যই আনন্দে উজ্জ্বল।

- ধন্যবাদ আপনাকে, অনেক ধন্যবাদ - গাঢ় গলায় বলল সে, সামনে ঝুঁকে এলো, টেবিলের ওপর রাখা ওনার হাতে হাত মেলালো।

মিস্টার বাসু বেরিয়ে গেলেন। দরজা আস্তে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক তখন তার নির্জন ঘর অতি ধীরে বিস্তীর্ণ মরু ধূসর ধূসর...অনুভব করছিল কি গভীর অবসাদ বিষাদ...

এমন আচ্ছন্ন সময়ে ক্রমশঃ সে শক্তি হারায় - এভাবে সে অসহায় বালক একা দাঁড়িয়ে থাকে বিক্ষুব্ধ প্রান্তরে...

এভাবে কত দীর্ঘক্ষণ, দরজা খুলে ঢোকেন সরকারবাবু, একটা খাম বাড়িয়ে ধরেন। বালকের মতোই হাত বাড়িয়ে নেয় সে। সরকারবাবু বেরিয়ে যান। সে

দেখে অতি পরিচিত হাতের লেখায় তার নাম ঠিকানা লেখা। খামের বাঁদিকে প্রেরকের নাম না পড়েও পড়া হয়ে যায় - দীনবন্ধু মিত্র, টাটানগর। আঙুল কি কাঁপে তার? সে চিঠি খোলে না, ধরেই থাকে। তার চারপাশে ঝড় আরও তীব্র।

জীবনে কোনে যুদ্ধ জয় থেকেই সে আনন্দ আহরণ করতে পারেনি। এমন কি ছাত্র জীবনে পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিনগুলিও তাকে আচ্ছন্ন করে রাখত গভীর অবসাদ। অথচ কোনো পরীক্ষাতেই সে খারাপ ফল করেনি। বস্তুতঃ আনন্দের উপাদান তার ওই একটিই। বাল্যকাল থেকে সে ওটাই আঁকড়ে আছে। ছেলেবেলায় তার অনেক অ্যাডভেঞ্চার এর বই ছিল। টাটানগর থেকে কলকাতা - রোজই কত লোকজন আসছে যাচ্ছে, বাবা কাউকে দিয়ে বই আনিয়ে দিতেন। এভাবে তার ঘরের তাকগুলিবইতে ভরে উঠেছিল। নানান বই, দেশ-বিদেশের নানান কাহিনি আর ছবি, সে ছবিতে নানা মানুষ, পশুপাখি, নদী পাহাড়,বন জঙ্গল, শহর, গ্রাম,বাড়ি ঘর, পথঘাট, যানবাহন।

এইসব বইগুলির মধ্যে তার সবচেয়ে প্রিয় ছিল জঙ্গল অভিযান, সমুদ্র অভিযান, মরুভূমি অভিযান। রেড ইন্ডয়ান আর বেদুইন, আফ্রিকার জংলী মানুষ আর মেরুদেশের এস্কিমো।

এসবের মধ্যে আবার সবচেয়ে প্রিয় বনভূমি। বনভূমি মানেই সবুজ সবুজ আর সবুজ! গাছপালা, লতাপাতা, ফুলফল, পাখি আর হরিণেরা। সেখানে দুরন্ত নদীর বালুকাময় তীরভূমি, তার কোথাও আছে চাঁদের পাহাড়, হীরার খনি।

ছেলেবেলায় সে প্রায়ই বাবার সাথে বেড়াতে যেত ছুটির দিনে। একটা জীপগাড়ি চেপে সে বাবা আর ড্রাইভার। পীচ ঢালা দীর্ঘ কালো পথ দ্রুত গুটিয়ে যেত চাকার নীচে। দুপাশে গাছপালা নদী পাহাড় ছুটে আসত, ছুটে যেত। এভাবে কোনোদিন তারা পৌঁছে যেত বিরাট এক সরোবরের তীরে। সেখান চারপাশে বনভূমে কত সব দীর্ঘদেহ গাছেরা নির্জন হাওয়ার রাজ্যে কথা বলবলি করে। সরোবরের ওপারে দূরে আরও দূরে নীল আর ধূসর পাহাড়েরা আকাশের গায়ে ক্রমশঃ বিলীন.... কোনদিন তারা আরও দূরে যেত, আরও গভীর বনে। পাহাড় পেরিয়ে চলে গেছে পাথর কাটা লাল মাটি পথ। সেখানে পথের পাশে

গভীর খাদ। অনেক নীচে বয়ে যায় শীর্ণ নদী, তার চলার আওয়াজে মুখরিত চারিদিক। আর কোনো শব্দ নেই, শুধু এক ঝুমঝুম আশ্চর্য্য কলস্বরে সব কিছু থমকে আছে। সেখানে গাড়ী থামিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকা, টুকটাক খাওয়াদাওয়া, তারপর আবার ছুট।

কোনোদিন তারা চলে যেত আরও আরও দূরে। জঙ্গল আরও গভীর। যেন দীর্ঘ গাছের সারি লালমাটির পথটুকুও বুক দিয়ে আগলে দাঁড়িয়ে। সেখানে তারা মানুষেরা যেন অনুপ্রবেশকারী। সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে পাহাড়ের কোলে এক ছোট্ট গ্রাম। সবুজ উপত্যকায় গরু চরছে, ছেলেরা খেলা করছে। সেখানে এক সুন্দর ঝরনা। ঝরনার ধারে পাহাড়ি গ্রামের ছেলেদের সাথে ছুটোছুটি খেলা করে কেটে যেত সারাদিন। তারপর ক্ষেত থেকে তুলে নেওয়া একগোছা ছোলাগাছ উপহার দিত তারা। সবুজ ছোলা খেতে খেতে সূর্যাস্ত বেলায় ফেরা....

ছুটিয়া দিনগুলিতে বাবা কোনোদিন ঘরে থাকতেন না। এভাবে ঘুরতে বেড়াতে ভালবাসতেন। অনেক দূরে ছুটে গিয়ে থমকে অলস বসে থাকতেন চুপচাপ। কখনো মন্থর পায়ে একা একা এগিয়ে যেতেন জঙ্গলের পথে, অথবা পাহাড়ী নদীর ধারে ধারে পাথরে পাথরে পা ফেলে, আর সে ছোট্ট বালক মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখত বনভূমি, ভালবাসত গাছেদের, জড়িয়ে যেত সবুজ মায়ায়....

ছোট্ট বালক শুনেছিল খুব ছোটবেলায় তার মা মারা গেছে। শুনেছিল - ব্যস, এজন্য তার মনে কোনো কষ্ট ছিলনা। যদিও সকলের কথায় এরকম বোঝাত মা মারা খুব কষ্টের কিন্তু তার কোনো কষ্ট ছিল না। সারাক্ষণ বাবা তাকে এতখানি ঘিরে থাকতেন! সকাল থেকে রাত পর্যন্ত। ভোরবেলা বাবা তার ঘুম ভাঙিয়ে দিতেন, বুড়ি আয়া আর চাকর সাধু চরণ ব্রেকফাস্ট তৈরিতে ব্যস্ত তখন। সে ফিটফাট হয়ে পড়তে বসে যেত। তারপর বাবা একসময় ডাকতেন, একসঙ্গে টেবিলে বসে খেতে খেতে গল্প, তারপর আবার পড়তে বসা। বাবা তাকে ঘন্টাখানেক পড়াতেন। তারপর ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে এসে হর্ণ দিতো, বাবা কারখানায় চলে যেতেন। তখন সে স্নান করে নিতো, বুড়ী আয়া তাকে সাহায্য করত। সাধুচরণ ভাত সাজিয়ে দিতো, খাওয়া হলে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে

আসত। বিকালে আবার সাধুচরণ তাকে স্কুল থেকে নিয়ে আসত। একটু পরেই বাবা ফিরতেন। খেলাধুলা, পড়াশোনা, খাওয়াদাওয়া, তারপর ঘুম - সে বাবার সাথে ঘুমাত।

কখন কখন দাদু ও দিদিমা আসতেন। তাঁরা মায়ের বাবা আর মা। তারা নাকি থাকে ডায়মন্ডহারবার নামে একটা জায়গায়। ওই যে রেল লাইন - ওটা শেষ হয়েছে সেই কলকাতায়, সেখান থেকে আরও অনেক দূরে ডয়মন্ডহারবার।
- ডায়মন্ড মানে তো হীরা আর হারবার মানে বন্দর,- তাহলে সেটা কি হীরের বন্দর, দাদু? বাবা দাদু দিদিমা তাই শুনে সকলে খুব হাসতেন। উত্তর না পেলে তার কৌতুহল আরও বাড়ত। সে জিজ্ঞাসা করত - আচ্ছা বন্দর তো সমুদ্রের তীরে থাকে, সেখানে দূর দূর দেশ থেকে জাহাজ আসে সমুদ্র পেরিয়ে, তাহলে ওখানে কি সমুদ্র?- কাছেই সমুদ্র - দাদু বলতেন।
- আমাকে নিয়ে চল - সে বলত। কৌতুহলে অস্থির সে। সমুদ্র এক আশ্চর্য জলরাশি। তার বর্ণনা সে পড়েছে। সমুদ্র দেখার জন্য সে ছটফট করত।
- ঠিক আছে, আমি তোমাকে নিয়ে যাব - দাদু বলতেন।
বাবা বলতেন - ঠিক আছে, আমরা দুজনেই একবার যাবো।
- কিন্তু সমুদ্র দেখতে গেলে তো আরও দূরে যেতে হবে - দিদিমা বলতেন।
- যাবে, কি আছে, এমন কিছু দূর নয় - দাদু বলতেন।

দাদু দিদিমা কদিন থেকে চলে যেতেন, আবার সে আর বাবা।

তারপর একদিন কলকাতা। স্বপ্নের শহর। বিশাল স্টেশন, গমগম শব্দ। লক্ষ মানুষ। গঙ্গা নদী। হাওড়া ব্রীজ। কি আশ্চর্য! কলকাতা - গাদাগাদি গাড়ি। হাওড়া ব্রীজের ওপর একঘন্টা কেটে যায়। একটুও বিরক্তি লাগে না। মনে হয় নেমে পড়ি, ঘুরে ঘুরে দেখি। সেতুর ধারে রেলিংএর কাছে গিয়ে ঝুঁকে দেখি জল। - যাবো বাবা?
- না রে পাগল, এক্ষুনি গাড়ি ছেড়ে দেবে।

এভাবে অনেক রাস্তা পেরিয়ে আবার এক স্টেশন, আবার ট্রেন। আবার গাছপালা ঢাকা গ্রামের মাঝে বিরাট এক দীঘির ধারে এক বাড়ি, সেখানে দাদু

আর দিদিমা। সে দীঘির ধারে বাগানে কত গাছ, নানান সব ফলের, আর সুপারি গাছের সারি, নারকোল গাছের সারি। দীঘিতে মাছেরা ঘাই দেয়, লাফিয়ে ওঠে।

সেই ডায়মনহারবার, সেই হীরক বন্দর।কি বিস্ময়! নদী কি বিশাল! ওপার দেখা যায় না। তারপর একদিন সমুদ্র দেখতে যাওয়া। নীল সমুদ্র। অনেক দূরে দ্বীপের হালকা আভাস। কি বিস্ময়! এই সেই সমুদ্র! কত দুঃসাহসী অভিজানের সমুদ্র!

মাঝে মাঝে একদিন সকাল সকাল খাওয়াদাওয়া সেরে কলকাতা দেখতে যাওয়া। সেখানে কত কি দেখার জিনিষ। চিড়িয়াখানা, জাদুঘর, মনুমেন্ট, গড়ের মাঠ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। আর এক জায়গা - সেটা বই পাড়া। সেখানে শুধু বই আর বই। শুধু বইয়ের দোকান। সেখান থেকে কত নতুন নতুন বই কিনে নিয়ে সন্ধ্যাবেলায় আবার রেলগাড়ি, আবার সেই নিঝুম গ্রাম, ঝিঁঝির ডাক...

সেখানে একদিন বাবা, সে, আর দাদু খেতে বসেছে, দাদু বলছিলেন -
বলছিলেন - দীনবন্ধু, যে মারা গেছে সে তো গেছেই, হয়েও গেল অনেকগুলো বছর, তোমাকে অনেকদিন ধরেই আমরা বলছি তুমি আবার বিয়ে করো। আমাদের কথা শোনো। কতই বা বয়স তোমার, পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ, এখনও সারা জীবন পড়ে আছে। মেয়ে আমার দেখা আছে, আত্মীয়ের মেয়ে। তাকে ভাল করে জানি, সে নীলুকে ভালবাসবে। কখনো অযত্ন করবে না। আর নীলুও মা পাবে। মা কি জিনিস ও জানে না। তুমি ভাল সময়েই এসেছ, কদিন থাকো, আমি সব ব্যবস্থা করছি, শুভ কাজটা সেরে যাও।

ছোট্ট বালক খাওয়া ভুলে হাঁ করে শুনছিল, হঠাৎ দাদু তার দিকে তাকিয়ে বললেন - কি হলো দাদু? খাও!

তারপর একদিন বাবা চলে গেলেন। একদিন যায়, দুদিন যায়, তিনদিন যায়, বাবা আসে না। সে অস্থির, পাগলের মতো। খেতে ভাল লাগে না, ঘুমোতে ইচ্ছা করে না ; কখন বাবা আসবে! বাগানের রাস্তা ধরে মন শুধুছুটে চলে যেতে চায়। দাদু দিদিমা কত বোঝান - বাবা আসবে, তোমার জন্য একটা সুন্দর মা আনতে গেছে। শুনে সে চিৎকার করে - না, আমার মা চাই না, চাই না, চাই

না, আমি বাবাকে চাই। তার বুকের মধ্যে হু হু করে। মনে হয় বুকের ভেতরটা কেমন শুকিয়ে গেছে। রাতে প্রায়ই সে স্বপ্ন দেখে -

কয়েকদিন আগে সে অনেক বই কিনেছে, তার মধ্যে একটা গল্প - একজন মানুষ যে মরুভূমির মধ্যে দস্যুদের আক্রমনে দল ছাড়া হয়ে হারিয়ে গিয়েছে, তার চারপাশে কেউ নেই, শুধু বালির পাহাড়, উপত্যকা, বালুময় ভূমিতে কোনো পথ নেই, আর তীব্র রোদ্দুর। মাঝে মাঝে ঝড় ওঠে, বালির ঝড়, চারিদিক অদৃশ্য হয়ে যায়, এরই মাঝে সেই মানুষ কষ্ট করে হাঁটে, তৃষ্ণায় বুক ফেটে যায়, ক্ষুধায় ক্লান্তিতে অবসন্ন - কাহিনীটা তাকে ভীষণ কষ্ট দিয়েছিল - এখন এরকম একটা দৃশ্যে সে ঘুমের মধ্যে হারিয়ে যায়.... চারপাশে বালির পাহাড়.... ঝড়... একা সে....ভীষণ কষ্ট....

কয়েকদিন পর বাবা এলেন। সে বাবার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, কেঁদে ভাসিয়ে দিল - তুমি আমার জন্য মা আনতে গিয়েছিলে? আমার মা চাই না, চাই না।

বাবার মুখ শুকনো, বললেন - কিন্তু খোকন আমাদের বাড়িতে আমি যে তাকে রেখে এসেছি, সে তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে, তোমাকে নিয়ে যেতে বলেছে। আমি যে তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাবো।

সে কোনো কথা বলল না, গুম হয়ে রইল। শুধু তার অনুভূতি তাকে বলছিল কি যেন সম্পদ তার খোয়া যেতে বসেছে।

তারপর বাড়ি ফেরার পালা। তারা যখন টাটানপর পৌঁছাল তখন রাত্রি। দরজা খুললেন ফর্সা সুন্দর এক মহিলা। সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। মহিলা হাসি হাসি মুখে তার হাত ধরলেন। সে এক ঝটকায় হাত সরিয়ে নিল। দ্রুত পায়ে নিজের ঘরে- এ কি?এখানে বিছানা কেন? সে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল।

বাবা খুব কুণ্ঠিত পায়ে ঘরে এলেন, বললেন - কিছু না এমনিই। তুমি তো এখন বড় হচ্ছো, এখন থেকে একা একা ঘুমোনো অভ্যাস করা উচিত। তোমার কি একা ঘুমোতে ভয় করবে? দরকার হলে তুমি আমাকে ডাকবে। দুই ঘরের মাঝে এইতো দরজা - তুমি ডাকলেই আমি উঠে আসবো, কেমন? অবশ্য ইচ্ছা করলে আজ তুমি আমার কাছেও ঘুমোতে পারো, কিন্তু তোমার আস্তে আস্তে

অভ্যাস করা উচিত।

- ও কোথায় শোবে? - সে আবার তীক্ষ।

- ও? - বাবা ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন - ও নয় খোকা, মা বলো - বাবার গলায় অনুরোধ।

সে মুখ ফিরিয়ে নিলো - আমার খিদে পেয়েছে।

- আমারও - বাবা বললেন - চলো আমরা একসঙ্গে খেতে বসব, আর গল্প করব, কেমন? তুমি জামা প্যান্ট ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে নাও।

খাবার টেবিলে গল্প কিন্তু জমে না। যদিও বাবা অনেক কিছুই বলছিলেন - সামনের রবিবার আমরা তিনজন জিপে করে বেড়াতে যাবো, সেই ঝরণার ধারে। - সে কিন্তু একটুও উৎসাহ দেখাচ্ছিল না, কথাও বলছিল না, চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছিল।

খাওয়া শেষে মুখ ধুয়ে সে সোজা নিজের ঘরে চলে গেল, শুয়ে পড়ল।

বাবা ঘরে এসে এটা ওটা নাড়ছিলেন। সে শুয়ে শুয়ে বুঝতে পারছিল। বইপত্তর গুছিয়ে রাখলেন, জানালার পাল্লা খুলে দিলেন, চড়া আলো নিভিয়ে মৃদু আলো জ্বেলে দিলেন, তারপর বিছানার কাছে এসে চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে নীচু গলায় বললেন - গুড নাইট। ঝুঁকে পড়ে গালে ঠোঁট ছোঁয়ালেন। সে নিঃশব্দ অনড়। বুঝতে পারছিল বাবা দরজা ভেজিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

তারপর রাত বাড়ছিল। তার ঘুম আসছিল না। সমস্ত শরীরে আগুনের মতো উত্তাপ। মাথা ঝমঝম করছিল। সে উঠে পড়ল, বিছানা থেকে নামল, বারান্দায় বেরিয়ে এলো, আস্তে এগিয়ে গেল বাবার ঘরের জানলার কাছে।

ঘরে মৃদু আলো জ্বলছে, বিছানায় - ও কি? ওরা কি করছে? ওরা দুজনে? গায়ে ভাল করে জামাকাপড় নেই, কি রকম পাগলের মতো, আঃ, কি করছে ওরা? দুজনে দুজনলে অত জোরে -

সে কিছু বুঝতে পারছিল না, কিন্তু একটা আশ্চর্য অনুভূতি তার শরীরে ছেয়ে যাচ্ছিল। কেমন একটা উত্তেজনায় সে অস্থির। তার মনে হচ্ছিল সেই ঝর্ণার ধারে উঁচু পাহাড়টা থেকে সে পড়ে যাচ্ছে, ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে সব কিছু...

সহসা আর্ত চিৎকার।

সে অপলক তাকিয়েছিল ওদের দিকে, হঠাৎ মহিলার আর্তনাদ, তিনি হাত তুলে জানালার দিকে ওকে দেখালেন, গায়ের কাপড় গোছাতে গোছাতে যেন বিছানা থেকে গড়িয়ে মেঝেয় পড়লেন, হাঁটুতে মুখ গুঁজে অস্ফুট স্বরে গোঁঙাতে লাগলেন - না - না না -

সে একছুটে ঘরে চলে এলো আর বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল। কি এক অদ্ভুত যন্ত্রণায় তার বুক ভেঙে যাচ্ছিল, চোখ ফেটে জল আসছিল। কাঁদতে কাঁদতে সে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল। সে জানল না বাবা আড়াল থেকে অপরাধীর মতো তার দিকে চেয়েছিলেন।

সকালে কেউ কারো মুখের দিকে তাকাচ্ছিল না। যেন কেউ কাউকে চেনে না। সে কোনক্রমে ঘাড় নীচু করে খেয়ে ঘরে গিয়ে পড়তে বসে গেল, কিন্তু অন্যান্য দিনের মতো বাবা তাকে পড়াতে এলেন না। এক সময় গাড়ীর হর্ণ বাজলে সে বুঝতে পারল বাবা বেরিয়ে গেলেন।

তারপর এভাবেই দিন কাটে। তিনজন মানুষ পরস্পর অপরিচিত, কারো সাথে কারো কথা নেই।

সে এত গম্ভীর না কি মূহ্যমান? যেন বুকের মধ্যে একটা কাঁটা বিঁধে আছে। আনন্দ নেই আহ্লাদ নেই শুধু এক যন্ত্রণা...দিনে দিনে দূরত্ব বেড়েই চলে।

রাতে ঘুমের মধ্যে হানা দেয় মরুভূমি, বাবা হারিয়ে যাচ্ছে মরুঝড়ে। সে কাছে পৌঁছাতে চাইছে, পারছে না।

একদিন দাদু দিদিমা এলেন, সে আকুল গলায় বলল - আমি তোমাদের সঙ্গে চলে যাব। - তাই যাক, দুদিন কাটিয়ে আসুক - উদাস গলায় বাবা বললেন। সেই দুদিন সময় বড় দীর্ঘ হয়ে গেছে। যন্ত্রণা ও জেদ পাশাপাশি দাপাদাপি করেছে তাকে, আর কেউ ফেরাতে পারেনি।

অতঃপর ছাত্রাবাসে শুরু হয়েছিল নতুন জীবন। দাদুর বাড়ির কাছাকাছি রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল - সেখানেই। তারপর এক ছাত্রাবাস থেকে আর এক ছাত্রাবাস....স্কুল থেকে কলেজ... কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়....

ছয়

যে যেখানে থাকো কেন
                    চিঠি দিও
দ্যাখো, আমার চারপাশে কোনো বৃক্ষ নেই
                              ছায়া দিতে
কিংবা কাছাকাছি কোনো নদী
যার কাছে পায়ে পায়ে হেঁটে গেলে
পেয়ে যাবো স্নিগ্ধ স্নান।

যে যেখানে থাকো কেন
                    চিঠি দিও
বনভূমি... সমুদ্র... পর্বত...
শঙ্খচিল... মেষপালক শিশু...
বৃষ্টিভারে অবনত মেঘ....

ভাবনার গভীরে ডুবে সে গিয়েছে কোথায় কোথায়....

অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। সরোবরের পাড় ধরে রাস্তার আলো সারি সারি। গাছেরা আধো আলো আধো ছায়ায় গুটিশুটি হয়ে ঘুমের তোড়জোড় করছে। ঈষৎ ঠান্ডা বাতাস - বিকালের একপশলা বৃষ্টির জের। অন্ধকার বারান্দায় সে বসে, সামনে বেতের টেবিলে একটা বই, বইয়ের নীচে চাপা দেওয়া একটা চিঠি। আধো অন্ধকারে সেগুলি ভাল দেখা যাচ্ছিল না, শুধু হাওয়ায় চিঠিটা উড়তে চেয়ে তার অস্তিত্ব জানাচ্ছিল। অন্ধকার সরোবরের দিকে তাকিয়ে সে কিছুই দেখছিল না। ভাবনার গভীরে ডুবে সে নিরুদ্দেশে হারিয়ে কোথায় কোথায়....বনভূমি....সমুদ্র....পর্বত....বৃষ্টিভার অবনত মেঘের গভীরে...

পিছনে ঘরে আলো জ্বলল, এসে দাঁড়াল সাধুচরণ, হাতে চায়ের কাপ,সন্ধ্যে

থেকে তিনকাপ হলো - চা রাখতে রাখতে বলল সাধুচরণ, চলে যেতে গিয়ে ফিরে দাঁড়াল - এই হাতকাটা গেঞ্জি গায়ে বারান্দায় কখন থেকে বসে আছ? ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে!

সে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, ঈষৎ হাসল, বলল - জামাটা এনে দাও। হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙল সে, শরীরটা পুণরায় চেয়ারে এলিয়ে দিল।

- কার চিঠি? টাটা থেকে বাবুমশায় লিখেছেন বুঝি? - টেবিলের দিকে চেয়ে বলল সাধুচরণ - কি লিখেছেন? মিনুমা কেমন আছে?

- ভালো - ছোট্ট উত্তর দিল সে।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল সাধুচরণ।

....চিঠিটা কি জীবন্ত? অমন নড়ছে কেন? - চিঠির খোলা অংশের দিকে তাকিয়ে ভাবল সে - অক্ষর গুলি কথা বলছে.... আমি, তোমার মা, ও তোমার বোন সকলে ভাল আছি। সাধুচরণ কেমন আছে? তোমার ওখানে ও চলে যাবার পর থেকে আমরা সকলেই ওর অভাব খুব অনুভব করি। বিশেষতঃ মিনু। সাধুচরণ তোমার মতো ওকেও তো ছোটটি থেকে মানুষ করেছে! অবশ্য ওকে তোমার ওখানে পাঠিয়ে তোমার ব্যাপারে আমরা খুবই নিশ্চিন্ত। চিঠির উত্তর পাওয়া আমার কাছে ভাগ্যের ব্যাপার, তবু আশায় রইলাম। - বাবা।

সাধুচরণ জামা এনেছে, চেয়ার ছেড়ে উঠল সে, জামা গায়ে দিল। নীচু হয়ে চিঠিটা সযত্নে তুলে নিল, ভাঁজ করল, বইয়ের ফাঁকে রাখা ছেঁড়া খামটা নিয়ে চিঠি ভেতরে রাখল।

ঘরে এসে আলমারি খুলল সে, একটা ড্রয়ার টানল, ড্রয়ারের মধ্যে সাজান অনেক চিঠি। বাবার কোনো চিঠি সে ফেলেনা কখনো। সারির শেষ প্রান্তে হাতের চিঠিটা গুঁজে দিল, তারপর সব চিঠিগুলির ওপর আলতো হাত বুলিয়ে স্পর্শ নিল, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল স্থির মূর্তির মতন।

....আছি মরুভূমে একা.... কোথায় কতদূর হে বনভূমি? আমার সংবাদ নিও.... সমুদ্র, তোমার অসীম জলরাশি আমাকে আকুল করে.... পাঠাতে পারো না কিছু সুনীল উচ্ছাস? শঙ্খচিলেরা, তোমাদের অক্লান্ত ডানায় নীল আকাশের ছোঁয়া

ছোঁয়া...পার তো আমার জন্য এনো নীল সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস... আছি মরুভূমে একা...চিঠি দিও... যে যেখানে থাকো কেন চিঠি দিও...

সাত

মুখে আঁটা কঠিন মুখোশ, চোখেতে কাচের মণি দ্যুতি হীন অভিব্যক্তি হীন এবং কন্ঠস্বর নিতান্ত যান্ত্রিক - এভাবেই সে তার সেক্রেটারির সঙ্গে প্রথম মুখোমুখি।

গতকাল বিকালে পার্সোনেল ডিপার্টমেন্ট থেকে জানানো হয়েছিল, তখন থেকেই তার মনে প্রতিক্রিয়া। রাতে ঘুমের মধ্যে চিন্তাটা চাপা থাকলেও সকাল থেকেই আবার মাথা চাড়া দিয়েছে।

এখন অফিস যাওয়ার সময় রোজই সে বইকে সঙ্গী করে গাড়িতে ওঠে। যেদিন থেকে তার মনে হয়েছে অধ্যয়নে সে অবহেলা করছে সেদিন থেকেই সে ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদিও এই যাত্রাপথটুকুতে পড়া হয় কয়েক পাতার বেশি নয় তবু দিনের কাজ শুরু অধ্যয়নে - এটুকু তাকে বেশ তৃপ্তি দেয়। কিন্তু আজ গাড়িতে উঠে বই খুলে পড়ায় মন না দিয়ে সে শুধুই ভাবছিল কিভাবে সে মেয়েটিকে কাজ সম্পর্কে আদেশ করবে, কতটুকু মাত্র কথা বলবে এইসব।

.... জীবনে এই প্রথম কোনো মেয়েকে আমি আদেশের অধিকারে - এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে সে অফিসে।

এতদিন সরকারবাবু সকলের সঙ্গে হলঘরে বসতেন, কিন্তু কয়েকদিন আগে তার চেম্বার সংলগ্ন একটি ছোট ঘর তৈরি করে দিয়েছে ইন্টারন্যাল ডেকরেটরের লোকেরা। ওটাই তার সেক্রেটারির ঘর। কখন মেয়েটি আসবে, এলে তাকে কিভাবে ঘরটর দেখাবে এসব ভাবতে ভাবতে নিজের চেম্বারে ঢুকে সে মুখোমুখি। ঘরের মাঝখানে কিংকর্তব্যবিমুঢ় মেয়েটি ভীরু চোখ তুলে বলল – গুডমর্নিং স্যার - এত আস্তে বলল প্রায় শোনাই গেল না।

সে এতটা ভাবেনি - মেয়েটি এসে গেছে। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল চোখে চোখ রেখে, ততক্ষণে সে চোখের ওপর সাজিয়ে নিয়েছে ভাবলেশহীন সাজ। -

গুড মর্নিং - বলল সে, এগিয়ে গেল চেয়ারের দিকে, বসতে বসতে টেবিলের গায়ে লাগানো সুইচ টিপল, বাইরে বেল বাজল। পুরোনো সুইচের পাশে লাগানো হয়েছে আরেকটি নতুন সুইচ, বুঝল এটার সংযোগ সেক্রেটারীর ঘরে, সেদিকে একপলক তাকিয়ে সে আবার তাকাল মেয়েটির মুখের দিকে, সে তাকিয়ে তারই দিকে, যেন আদেশের অপেক্ষায়।

ঘরে ঢুকল বেয়ারা।

- ষরকারবাবু - ছোট্ট করে বলল সে। বেয়ারা বেরিয়ে গেল।

- টেক ইয়োর সীট্ - না তাকিয়েই বলল সে, সরকারবাবু ঢুকলেন।

- আসুন সরকারবাবু, বসুন, আপনার জন্য একটা সুসংবাদ অপেক্ষা করছে। সত্যি কথা বলতে কি, আপনার জন্য কিছু করতে পেরে আমি আনন্দ বোধ করছি। আজ থেকে আপনি পাবলিসিটি এ্যাসিস্ট্যান্ট পদে উন্নীত হলেন। অনেক কাজের দায়ীত্ব আপনি নিজে থেকেই হাতে তুলে নিয়েছেন তাই আপনাকে বিশেষ কিছু বলার নেই। এখন থেকে টাইপিং এর কাজ করবেন মিস্ মার্সিয়া বিশ্বাস। আপনি ওকে সব কিছু বুঝিয়ে দিন।

তারপর....

টুক টুক... টুক টুক টুক.... টুক টুক টুক টুক.... টুক টুক.... সারাক্ষণ জেগে থাকে ওই দিকে যেন এক শব্দের কুঠুরি। বন্ধ দরজার এপারে যদিও সে শব্দ ক্ষীণ তবু এই নিস্তব্দ ঘরে এ নতুন সংযোজন সারাদিন একজনের অস্তিত্ব জানায়। আজ কাজের চাপও খুব বেশি। ভাবলেশহীন মুখে সে একটার পর একটা অনেক ডিকটেশন দিয়েছে টেবিলের ওপর ফাইলে চোখ রেখে। অথচ এখন দিনের শেষে সব কাজ শেষ। সরকারবাবু যদিও কাজে দক্ষ কিন্তু একটু ঢিলেঢালা।

অতি পরিচ্ছন্ন টাইপ করা শেষ চিঠিটিও সই করে বাড়ানো হাতে তুলে দিতে গিয়ে সে ঘাড় একটু কাত করে সৌজন্যের হাসি হাসতে বাধ্য হলো। কাজের উৎকর্ষতা জন্য মর্যাদা পাওয়া - হাসি মুখে মাথা ঈষৎ ঝুঁকিয়ে

মার্সিয়া বলল - থ্যাঙ্কস।

বাড়ি ফেরার সময় গাড়িতে হেলান দিয়ে বসে মেজাজে সিগারেট ধরাল সে, ...বুঝলে বুড়ো, আমি জিতে গেছি - মনে মনে মলল সে, ফুস করে ধোঁয়া ছাড়ল - তুমি বুঝতেও পারলে না তোমাকে কেমন কলা দেখালুম! ফাঁদে ফেলতে আমাকে তুমি পারবে না। পরম নিশ্চিন্তে নিঃশ্বাস ফেলল সে। সারাদিন একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে একবারও মনে হয়নি একটি মেয়ের সঙ্গে কাজ করতে হচ্ছে। মেয়েটি ওর টাইপ মেশিনের মতোই নিরাপদ।....তথাপি সে বন্দী থাকে বিষন্ন আঁধারে.... হিরন্ময় দশ বারো দিন হলো বম্বে অফিস গেছে। কবে ফিরবে কে জানে! মিস্টার সরখেলও আজ অনুপস্থিত। ফাঁকা গাড়িতে তার মেজাজ আরও উচ্ছসিত হওয়া উচিত, কিন্তু হচ্ছিল না। বরং একটা ক্ষীণ ইচ্ছা তার মন ছুঁয়ে গেল, মনে হলো হিরন্ময় পাশে থাকলে কিছু বললে ভালই লাগত।

অথচ হিরন্ময় যখন আবার তার নিত্য সঙ্গী তখন সে আবার ঝিনুকের মতো তার শক্ত আবরণের মধ্যে। একদিন, দুদিন, তিনদিনের দিনও যখন অফিস যাবার সময় সে গাড়িতে উঠে যথারীতি বই খুলে বসল সেদিন হিরন্ময় একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে তারপর বাইরের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে একলা একলাই কথা বলা শুরু করল। উদাস গলায় বলল - বম্বে যাবার আগে কদিন দেখে গিয়েছিলুম এই নতুন ঢং, তখন ঠিক ঠিক বুঝতে পারিনি, এখন বেশ বুঝতে পারছি। তা অতো বাঁকা রাস্তায় যাবার দরকার কি? সোজাসুজি বললেই হয় - তুমি আমার পেছনে বাঁশ দিচ্ছ, আমার খড়ের চালে আগুন দিচ্ছ, তাই তোমার সঙ্গে আমি মিশব না। তা নয়, ঘুরিয়ে নাক দেখানে। ওরে শালা, এ আবার সরখেলের চেয়েও হারামখোর!

- শুধু শুধু সকালবেলা গালাগাল করছ কেন? - বই থেকে মুখ তুলে বলল সে।

- আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি না - বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল হিরন্ময় - আমি নিজেকে গালাগালি করছি। আমি শালা হারামি, ভাল ছেলেকে খারাপ করে বেড়াই। ভাল ছেলে এখন যুবতী স্টেনো পেয়েছে, এখন বন্ধ ঘরে বসে বসে ভাল ভাল কেত্তন শুনবে, শুনে কান শুদ্ধ করবে! ঠিক আছে, আমি না হয় ফুলের

সাপ্লায়ারকে রোজ কিছু তুলসীপাতা দিতে বলবখন, আর একটু গঙ্গাজল। গঙ্গাজলে রোজ টেবিল মুছে দেবে কৃষ্ণদাসী, তারপর ফুলতুলসী মাঝখানে রেখে দুজনে বসবে দু'দিকে -

সে বইটা দিয়ে ঠুস করে মারল হিরন্ময়ের বাহুতে - বিশ্বাস করো, আমি সত্যিই কিছু পড়াশেনা করছি, আর কিছু নয়।

- কি হবে এত পড়ে? - বাইরের দিকে তাকিয়েই বলল হিরন্ময়।

- কি যে বলো, এতো কোথায় দেখছ? পৃথিবীর ভান্ডার কি বিশাল বলতো? তার কতটুকু আমি নিতে পারি?

- নিয়ে কি হবে? যদি তোর জীবনে কাজে না লাগল তাহলে আর পড়ে লাভ কি? নাটক নভেলে বেশীর ভাগই তো প্রেমের গল্প, তা ওগুলো তোর কোন কাজে লাগছে? ওই থিয়োরিটিক্যাল ব্যাপারে তুই কতটুকু আনন্দ পাবি? জীবনে ওই থিয়োরি প্রয়োগ করলে দেখবি অনেক বেশি আনন্দ। তবে কি না -

হিরন্ময় এবার ভাল করে ঘুরে বসল, বলল - তবে কি না তোর বইয়ের আলমারিতে একদিন নেড়েচেড়ে দেখছিলাম, দেখলাম অর্ধেকই ছোটদের বই।

- কিন্তু ওগুলো পৃথিবী বিখ্যাত।

- হোক, তবু ছোটদের। তার মানে তুই এখনও ছেলেমানুষ। আচ্ছা, তোর বয়স কত হলো?

- এই, আঠাশের মতো।

ইস্ - একটা শব্দ করে উঠল হিরন্ময়, য়েন কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে। - জীবনে তুই কি হারিয়ে ফেললি তুই নিজেই জানিস না রে! ষোল বছর বয়স তুই অনেকদিন পার হয়ে এসেছিস, পনেরো ষোল বছর বয়সে আসে সেই অনুভব। তখন কেমন জানিস তো? বিশেষ কোনো একজনের জন্য বুকের মধ্যে ছলকে ওঠে রক্ত। বেশি কিছু নয়, শুধু দেখা। তাও হয়ত দূর থেকে। হয়তো দিনে একটিবার, এক মুহূর্তের জন্য। হয়তো দিনে একবারও নয় - সাত দিনে একদিন দেখা - তা সেই না দেখা দিনগুলিতে কি যন্ত্রণা, কি আকুলতা! তারপর দেখা পেলে বুকের মধ্যে কি বিপ্লব, কি সুখ! তারপরও যদি আলাপ হয়ে যায়

যদি কথা হয়ে যায় একটি দুটি, যদি আঙুলে আঙুল ছুঁয়ে যায়! আঃ! এসব বলে বোঝানে যায় না রে!

হিরন্ময়ের কণ্ঠে কি যেন আবেগ থরথর করে, নিজের দুহাতের আঙুলে আঙুল জড়ায় হিরন্ময়, বলে - তারপর কুড়ি বাইশ বছর বয়সে সে ভাললাগা তখন আরও পূর্ণতায়, তখন শুধু কথা। কত কথা জমা থাকে বুকের মধ্যে - সব উজাড় হতে চায়। নির্জনে ঘন্টার পর ঘন্টা শুধু কথা বলা। ঘুরে ঘুরে কথা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা, বসে বসে কথা। আর একটু হাত ধরা, আঙুল নিয়ে খেলা করা - কি যে তরঙ্গ ওঠে রক্তের মধ্যে! রক্ত শুদ্ধ হয়ে যায়।

একেবারে চুপ হয়ে গেল হিরন্ময়, কি যেন ভাবল, তারপর বলল - এভাবে এগিয়ে আসে পঁচিশ বছর বয়স, তখন মানুষ চায় গাঢ় আলিঙ্গন, গাঢ় চুম্বন - আরও আরও কিছু। এই হচ্ছে ঠিক বিবাহের বয়স, জানিস, ভোগ আর তৃপ্তির বয়স। এ বয়স মন আর শরীরের গঙ্গা যমুনা সঙ্গম। তুই সে বয়সকাল পেরিয়ে যাচ্ছিস। তিরিশ পেরোলে আমার মনে হয় মানুষের মধ্যে থাকে শুধু সেক্স, শুধু শরীর, মন মরে যায়।

দুজনেই চুপচাপ। সর্বদা নীচু স্বরে কথা বলে হিরন্ময়। এখন গাড়ির মধ্যে শুধু ইঞ্জিনের শব্দ। মিস্টার সরখেল ছুটিতে আছেন, তাই গাড়ি সোজা বেরিয়ে এসেছে। অফিস এসে গেল প্রায়।

- এসব তত্ব কথা আমি কিছুই বুঝিনা - বইয়ের পাতা এলোমেলো ওড়াতে ওড়াতে বলল সে।

- হ্যাঁ, তুই বাল্যকাল থেকে সোজাসুজি বার্ধক্যে পৌঁছে যাবি। যেদিন প্রাণপাখি দেহ ছেড়ে চলে যাবে, সেদিন চুল জ্বলে যাবে শুকনো ঘাসের মতো, হাড়গোড় জ্বলে যাবে কাঠকুটোর মতো, আর এই সুন্দর সোনার শরীর কয়লার মতো পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এসব মহাজনদের কথা রে! তাই যতদিন পৃথিবীতে আছিস যা করার করে নে, আর করতে গেলে সময় থাকতে থাকতে করাই ভাল।

আট

ফুলের সওদাগর সপ্তাহে দুদিন এ অফিসে ফুল যোগান দেয়। ঝাঁকা মুটের মাথায় চাপিয়ে চলে আসে ফুলের সম্ভার, চলে যায় রিসেপশন থেকে শুরু করে বিভিন্ন চেম্বারে।এই তালিকায় তার অফিস ঘরেরও নাম আছে। পাবলিসিটি এন্ড পাবলিক রিলেশন - এ ঘরে অনেক মানুষের যাওয়া আসা, এখানে সুরুচির বহিঃপ্রকাশ অবশ্য প্রয়োজন।

এতদিন পর্যন্ত বেয়ার ফুলের স্তবক নিয়ে এসে ফুলদানিতে গুঁজে দিতো যেভাবে বাঁধা আসতো সেভাবেই। কিন্তু ইদানিং সে লক্ষ্য করেছে ব্যাপারটায় কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। ফুলের স্তবকে মনে হচ্ছে কিছু অতিরিক্ত সৌন্দর্য। আলগা ফুলগুলির কোনোটি উঁচু কোনটি নীচু, কোনোটি ঈষৎ হেলানো, মাঝে মাঝে ছোটখাটো পাতার বাহার - একটু সামান্য এদিক ওদিক এতেই ফুটে উঠছে আশ্চর্য সৌন্দর্য। যদিও এসব কিছুই ঘটে তার চোখের আড়ালে তবু বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই এই সৌন্দর্যে কার হাতের ছোঁয়া। সে অফিসে পৌঁছনার আগেই মার্সিয়া অফিসে পৌঁছে যায়। নিখুঁত গোছানো ঘরে সে যখন পা দেয় মার্সিয়া মাথা ঈষৎ ঝুঁকিয়ে তাকে গুড মর্নিং জানায়, প্রত্যুত্তরে তাকেও গুড মর্নিং বলতেই হয়, তখন মার্সিয়া নিজের ঘরে চলে যায়।

বেয়ারাকে ডাকার জন্য সে দীর্ঘ বেল - কঁ-অ-অ-ক্ বাজায়, মার্সিয়ার জন্য কঁক্ কঁক্ - ছোট্ট দুটি আওয়াজ - এটা জানিয়ে দিয়েছে সে। ডাক পড়লে চলে আসা, কাজ বুঝে নেওয়া এবং ফিরে গিয়ে কাজ শেষ করে আনা - এসব কিছু করে এমনই নিঃশব্দে যে মাঝে মাঝে সে ভুলেই যায় ওর অস্বিত্বের কথা। কখনো কখনো তার সন্দেহ হয় ও ঠিকঠাক শুনতে পাচ্ছেতো? কিন্তু কাজ শেষ করে আনলে নিঃসন্দেহ হতেই হয় যে ওর শোনায় কোনো ত্রুটি নেই। এসব সময় সে নিজেই নিজেকে বাহবা দেয় আর নিজেই সে বাহবা কুড়োয়। তার শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে সামনে দাঁড় করিয়ে খুব খানিকটা নেচে কুঁদে নেয় - হায় হায় বুড়ো, কুচুটে বুড়ো! তুমি বুঝতেও পারলে না তোমাকে ঠকিয়ে আমি কেমন জিতে গেছি। আর এক প্রতিপক্ষ হিরন্ময়। অবশ্য হিরন্ময় ঠিক প্রতিপক্ষ নয়, কিন্তু হিরন্ময়ের বচন জ্বালার উপযুক্ত জবাব না দিতে পারার জন্য তার মনে যে

প্রতিক্রিয়া ঘটে সেই পরিপ্রেক্ষিতে সে যখন কোনো ব্যাপারে ঠকাতে পারে তখন আত্মপ্রসাদে ডগমগ হয়। তেমনই কিছু পরিস্থিতি আজ ঘটতে চলেছে। আজ হিরন্ময় এমন ঠকান্ ঠকবে!

আজ অফিস আসার সময় হিরন্ময় বলল - আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম তোর ঘরে একটা মেয়ে এসেছে অথচ তুই আমাকে দেখানোর জন্য একবার আমন্ত্রণ জানালি না? আমি কি তোর মেমসাহেবকে পকেটে করে নিয়ে চলে আসব?

- এ আর বলার কি আছে? যে কোনো দিন আমার চেম্বারে চলে এলেই হয়।

- ছিঃ ছিঃ! আমার কি প্রেস্টিজ বলে কিছু নেই? তুই না বলাতেই হ্যাংলার মতো গায়ে পড়ে তোর ঘরে গিয়ে - ছিঃ ছিঃ!

- ঠিক আছে, এখন তো বললাম, এবার আর আসতে আপত্তি কি?

- এখন আর বললেও আমি যাবো না।

- এসো না। - ছোট্ট করে বলল সে, মনে মনে খুব খানিকটা হেসে নিলো, হিরন্ময় কি আর না এসে থাকতে পারবে?

ঠিক বারোটার সময় হিরন্ময়ের ফোন - নীলু, আমি দুটো আঙুল তুলেছি, একটা আঙুল ধর্ , ছোটটা না বড়টা?

- ছোটটা - হাসতে হাসতে বলল সে।

- ঠিক আছে, তাহলে ফার্স্ট আওয়ারেই লাঞ্চে চলে আয়, জরুরি কথা আছে।

- কি কথা? ফোনে বললেই তো হয়।

- তোকে যা বলি তাই শোন্ না - হিরন্ময় ধমক দিল - ঠিক আসবি কিন্তু। আমি তোর জন্য টেবিল আগলে বসে থাকব - বলেই ফোন রেখে দিল।

রোজ লাঞ্চের সময় সে ডাইনিং হলে যায় একেবারে সময়ের শেষাশেষি। এ ব্যাপারে তার চিরাচরিত অভ্যাস - অর্থাৎ সঙ্গ এড়ানো। সময় মতো গেলেই দু তিন জনের সঙ্গে বসা, কি গল্পগুজব, আড্ডা। যদিও সে জানে বোঝে এটাই সকলে চায়। কাজের চাপের ফাঁকে একটু অবকাশ - কিন্তু সে পারে না।

সম্ভবতঃ আজ প্রথম সে এত তাড়াতাড়ি ডাইনিং হলে এল। হিরন্ময় বসেছে দুটি চেয়ার দেওয়া একটা টেবিলে।

- কি এমন জরুরী ব্যাপার যে বিকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা গেলনা? - বসতে বসতে বলল সে।

- কি আর বলব নীলে, শেষে আমাকেই নীচু হতে হলো। তুই আমার মান ভাঙাবি, সে ভাগ্য কি আর আমি করেছি! আঙুল তুলে ঠিক করলুম তোর ঘরে যাবো, না তোকে ডাইনিং হলে ডাকবো। দ্বিতীয়টাই তুই ঠিক করলি। এখানে তোকে ডাকা তোর মেমসাহেবকে দেখার জন্য।

ঠিক এই মুহূর্তে সে খুব খুশি। এখনই কি ভীষন ভাবে ঠকে যাবে হিরন্ময়।

- এই ব্যাপার? আমি ভাবলাম কি না কি! - বলতে বলতে ঈষৎ ঘাড় ফেরাল।

ওদিকে একটা লম্বা ডাইনিং টেবিলে মেয়েদের খাওয়ার ব্যবস্থা। হিরন্ময় বেছে নিয়েছে এমনই একটা টেবিল যেখান থেকে ওটা ভাল দেখা যায়। ঈষৎ মুখ ফিরিয়েই দেখতে পেল সে, কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র - সে যেন সিঁটিয়ে গেল - আরও কয়েকটি মুহূর্ত - চোখ ফিরিয়ে নিল, ঝুঁকে পড়ল স্যুপের পাত্রের ওপর।

- কি হলো? বললি না কোনটা? - হিরন্ময় অধৈর্য। দ্য লাষ্ট লেডি অফ দ্য টেবল - কোনো রকমে বলল সে।

মার্সিয়া বসেছে লম্বা টেবিলের শেষ প্রান্তে। ওকে পরিস্কার দেখতে পেয়েছে সে এবং এতোটা তফাৎ থেকেও সে ওর মুখের প্রতিটি কম্পন যেন দেখতে পাচ্ছিল। অমন করে সে কোনোদিন কাউকে খেতে দেখেনি।

- কে? - হিরন্ময় প্রায় চেঁচিয়ে উঠল - ওই সিড়িঙ্গে? - গলা নামিয়ে আনল - তোর কপালে এই ছিল?

- ভালই তো, আমি এরকমটাই চেয়েছিলাম।

- তার মানে?

- মানে আর কি! কোনো ফিলিংস জাগবে না।

- তোর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে।

এতগুলি কথা হলো কিন্তু একবারও মুখ তুলল না সে, মাথা ঝুঁকিয়ে শুধু খেয়েই চলেছে।

- ও কি খাচ্ছে না গিলছে রে? - মুখ না তুলেও সে বুঝতে পারল হিরন্ময় অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। চুপচাপ অল্প কিছু খেয়ে উঠে পড়ল সে। খেতে ভাল লাগছিল না তার। - এক্সকিউজ মি হিরন্ময় - বলে চেয়ার ঠেলে বেরিয়ে গেল।

বিকালে বাড়ি ফেরার সময়ও গাড়িত সে হিরন্ময়ের সঙ্গে একটি কথাও বলল না। কেমন এক লজ্জা। সে বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে রইল।

আর এখন এই সন্ধ্যাকালে শীর্ষাসনে যখন রক্তের তীব্র স্রোত মস্তিস্কের মধ্যে এক নদী - সে নদী মনের গভীরে কি খুঁজে ফেরে...

এখন সন্ধ্যাকালে তার শোবার ঘরের মেঝেয় সে শীর্ষাসনে স্থির। এভাবে স্থির সে ধীরে ধীরে মনের গভীরে চলে যায়। গভীর চিন্তা অর্ন্তমুখী হতে হতে সে বিস্মৃত হয়ে যায় পরিপার্শ্ব।

....ক্ষুধা ও ফুল... ফুল ও ক্ষুধা.... ফুলের প্রতি যার অমন দরদ...

খাওয়া ব্যাপারটা জীবনে অবশ্যই একটা প্রয়োজনীয় ব্যাপার। কিন্তু তার মধ্যে একটা শোভনীয়তা থাকবে না? আঃ, কি বিশ্রী - মাথার মধ্যে ঝনাৎ করে উঠল, আস্তে আস্তে শুয়েপড়ল সে।

তখন তরঙ্গ গুলি ধীরে ধীরে স্থির - বিশ্রী নয়, কেমন করুণ - মনে হলো - যেন কতদিন খায়নি!

হয়ত ভাল করে খেতে পায় না। পোষাক-আসাকের অবস্থাও তো মোটেই ভাল নয়। মুখ দেখলে মনে হয় গায়ে যথেষ্ট রক্ত নেই। কিন্তু ওর সুরুচি, ওর পরিচ্ছন্নতা, ওর সৌন্দর্যবোধ -

শবাসন ছেড়ে উঠে পড়ল সে।.... হিরন্ময়, তুমি ওর সম্বন্ধে আরেকটু শোভন ভাষায় কথা বলতে পারতে।

....কিন্তু আমি নিজে কি করেছি? হিরন্ময়ের কথার বিচার করছি, অথচ আমি কি ওই শীর্ণ মেয়েটিকে হিরন্ময়কে দেখিয়ে মজা পেতে চাইনি? আমার নীচতা ?

মাথা নীচু করে সে দাঁড়িয়ে থাকে স্থির। কোমরে সামান্য বস্ত্র প্রায় নগ্ন তাকে বিষন্ন এক নিঃস্ব মূর্তির মতা দেখায়।

নয়

....কে তুমি আমার কাছে ছুটি চাও?... বুকের ভেতর সব ঝরিয়ে দাও মাটি....শিকড়ে বাকড়ে লাগে বাউরিয়া হাওয়া....ছুটে যায় বাঁধনের ঘুম....কে তুমি প্লাবন আনো....বেজে ওঠে ভাসানের গান....কে তুমি - স্বগতোক্তির মতো কথাগুলি বলল সে, অস্ফুট উচ্চারণে, থেমে থেমে, ধীরে ধীরে। তার অফিস ঘরের চেয়ারে সে হেলান দিয়ে প্রায় অর্ধশায়িত, হাতে কবিতার পান্ডুলিপি। কবি - এ সংস্থারই একজন যন্ত্রবিদ। সে অনুবাদের কাজ করছিল। টেবিলের উল্টো দিকের চেয়ারে - ঠিক তার সামনা সামনি নয়, একটু বামে সরে বসেছে মার্সিয়া, কোলের ওপর রাখা খাতা, হাতে পেন্সিল। এভাবেই ডিকটেশন নিতে অভ্যস্থ ও, কখনোই টেবিলের ওপর রেখে নয়।

ভাষান্তরের কাজে এবার সে কিছু সুবিধা পেয়েছে। অন্যান্যবার লেখাগুলির ইংরাজি অনুবাদ নিজ হাতে লিখে তারপর সেগুলি সরকারবাবুকে দিলে উনি টাইপ করে ছাপতে পাঠাতেন, এবার সেটা অনেকখানি সহজ হয়ে গেল। ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল এভাবে -

বম্বে ও মাদ্রাজের লেখাগুলি বছাই করে অনুবাদ করে পাঠান মিস্টার আধারকার ও মিষ্টার গোপালন। সেগুলি সে পুনর্লিখন করে। এবার ওই লেখাগুলিই প্রথম শুরু করেছিল সে। লিখতে গিয়ে কি ভেবে মার্সিয়াকে ডেকে সোজাসুজি বলে গিয়েছিল। এভাবে কিন্তু কাজটা ভালই দাঁড়িয়ে গেল। পরবর্তী পর্যায়ে সে তখন বাংলা লেখাগুলিও ওভাবেই ভাষান্তরের সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু এটা অতো সহজ নয়। ব্যাপারটা দাঁড়াল রেডিওতে মন্থর খবর পড়ার মতে। সক্রিয় অনুভূতি অথচ নিজের অবস্থান যেন কোনো অদৃশ্য গভীরে। মূল লেখাটি হাতে নিয়ে সে সোজা হয়ে বসে শুরু করলেও ক্রমশ ভাবনার গভীরে সে কখন ধীরে ধীরে অর্ধশায়িত হয়ে স্বগতোক্তির মতো কথা বলছিল। কখনও একবার বলা কথা বাতিল করে নতুন কথা সাজচ্ছিল। মার্সিয়া যেন এক অস্তিত্ব বিহীন অবয়ব। সামনে বসে, কিন্তু জেগে কি ঘুমিয়ে, আঙুল চলছে কি চলছে না বোঝা দায়।নিজে লেখার চেয়েও এভাবে বলার মধ্যে সে এক নতুন স্বাদ আবিস্কার

করেছে। অনুভবের আরও গভীরে কোথাও নেমে যাওয়া - লেখাটা আরও সৃষ্টিমূলক হয়ে ওঠে। এমনিতেই লেখাগুলি শুধু অনুবাদ করলে তো হয় না, লেখকের প্রকাশ ভঙ্গি, অনুভব বজায় রেখে ' ট্রান্সক্রিয়েশন ' করতে হয়।

এভাবেই কাটল বেশ কয়েকটি দিন। একটানা পরিশ্রম। শেষ বেশ এই লেকাটি পড়তে গিয়ে তার মনে হচ্ছিল সে সত্যিই বড় ক্লান্ত। কবিতাটি যেন তাকে স্মরণ করাচ্ছিল ছুটি চাই, বিশ্রাম....

.....কিন্তু এখনও অনেক কাজ বাকি। এসব লেখা সাজানো গোছানো - ছবিতে, রঙে, রেখায়। যদিও সেসব শিল্পীর কাজ তবু নিজে না দেখলে তৃপ্তি হয় না। অথচ কে যেন আমারই মধ্যে ছুটি চায়....

তার অফিস চেম্বারের পূবের দেওয়াল প্রায় পুরো কাচের। দেওয়ালে যেন হেলান দিয়ে আছে নীল আকাশ। আকাশের সেই অংশটুকুর দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। বৃষ্টিতে কি শুধু ধুয়ে মুছে স্নিগ্ধ হয়ে যায় পৃথিবীর বুক? অথবা আকাশও? না হলে শরতের আকাশ এত নীল কেন? কোথাও সামান্য কলঙ্ক নেই বা ধূসরতা। ছুঁয়ে নিলে মনে হয় সমস্ত শরীর মন স্নিগ্ধতায় ভরে যাবে! আর কদিন বাদেই পুজোর ছুটি। দশ দিনের এই ছুটিতে আমি কি করব? এই শহর, এই ভীড় - শহরের পথঘাট আরও মানুষে মানুষে ভরে যাবে। আরও গুমোট হবে বাতাস। তাহলে?

....' অনেক অনেক দূরে আছে মেঘমদির মহুয়ার দেশ '.... সেই দেশে চলে গেলে - সেই বাল্যকালের দেশে -সহসা তার চোখ পড়ল মার্সিয়ার ওপর, লজ্জিত হলো, চোখ রাখল কবিতার ওপর। কাজটুকু শেষ করতে হবে। এবারের কাজে মার্সিয়ার অবদান বড় কম নয়, কিন্তু মার্সিয়াও কি আমার মতো ক্লান্ত? কাল থেকে ওর কাজে বেশ কিছু ভুল ত্রুটি চোখে পড়ছে যেটা ওর পক্ষে প্রায় অসম্ভব। কিন্তু কাজ তো ক্লান্তির কথা শুনবে না।

- হোয়াটস্ রং উইথ ইউ? - চোখ তুলে কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে বলল সে। এইমাত্র সে কলিংবেল এর বোতাম টিপেছে, মার্সিয়া যথারীতি টেবিলের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তার বাঁহাতে খাতা ডান হাতে পেন্সিল, দুটো হাত বুকের

কাছে জড়ো করা। অভ্যাস মতোই ওভাবে দাঁড়িয়ে বলেছে - ইয়েস স্যার।

টেবিলের ওপর হাত দিয়ে সে ধরে রেখেছিল একটি পাতা, পাতাটি পুরো টাইপ করা। এই পাতায় পুরো চোদ্দটি ভুলের নীচে দাগ দিয়েছে সে। পাতাটি তুলে ধরে সে বলল - হোয়াটস্ রং উইথ ইউ?

অবাক চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল মার্সিয়া, সম্ভবতঃ ব্যাপারটা বুঝতে খানিক সময় নিল, তারপর কেমন কেঁপে, বুকের কাছ থেকে হাত দুটি খসে পড়ল টেবিলের ওপর, তার ম্লান চোখে করুণ অস্থিরতা, ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে ফিস ফিস করে বলল - এক্সকিউজ মি, প্লিজ এক্সকিউজ মি স্যার - বলতে সে যেন মুচড়ে ভেঙে গেল, চেয়ারে বসে পড়ে বলল - এ আমি জি করেছি? আঃ, এ আমি কি করেছি? - যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে এভাবে বলল - আপনি রাগ করবেন না স্যার, আর কক্ষনো এরকম করব না। আপনি আমাকে আর একবার সুযোগ দিন। আপনি আমাকে এই চাকরি দিয়েছেন, আপনি রাগ করলে আমার চাকরি থাকবে না। তাহলে আমি বাঁচবো না স্যার, প্লিজ গিভ মি এনাদার চান্স, প্লিজ।

- হু টোল্ড ইউ দ্যাট আই হ্যাভ গিভন ইউ দিস জব? - বলতে বলতে সে চেয়ার থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠল, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল, অন্য সব চিন্তা মাথা থেকে সরে গেল তার - কে বলেছে? বলো, কে বলেছে? - চাপা গলায় গর্জন করে উঠল সে।মার্সিয়া থতমত। মুখ তুলে অবাক চোখে তাকাল, মুখ ভয়ে শুকনো, কোনক্রমে বলল - রিক্রুটিং অ-ফি-সা-র।

- কি বলেছেন?

- বলেছেন, আপনার দয়ায় আমার চাকরি হচ্ছে, আমি যেন মন দিয়ে আপনার কাজ করি, কখনো অবাধ্য না হই - ভীত গলায় বলল।

- আর কিছু বলেছেন?

মার্সিয়া দুপাশে মাথা নাড়ল, তার ঠোঁট দুটি ঈষৎ ফাঁক।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল, তাকিয়ে দেখল মেয়েটির ভীরু চোখ, পান্ডুর মুখ। দেখতে দেখতে কেমন এক মায়া বুক জুড়ে।

মার্সিয়ার মূর্তির মতো শরীরে ঠোঁট দুটি শুধু নড়ে উঠল, অস্ফুট স্বরে কথা বলল সে, বলল - হয়তো আমাকে দেখে আপনার মনে হয়েছিল আমি দুঃস্থ, তাই আপনার দয়া হয়েছিল, এখন থেকে আমার আর ভুল হবে না, আমি খুব চেষ্টা করব - বলতে বলতে কথা জড়িয়ে চুপ করে গেল, চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল দুগালে।

সে খুবই বিচলিত - আ- কেঁদনা - ডোন্ট ক্রাই, চোখ মুছে নাও। কি মুসকিল! মার্সিয়া -

মার্সিয়া দুবার ফোঁপাল, হাতের তালুতে চোখ মুছল, মুখ নীচু করে বসে রইল।

- আমি বলতে চাইছিলাম, তুমি কি অসুস্থ? না কি তোমার বাড়ীতে কিছু হয়েছে? কাজতো তুমি ভালই করছিলে, অথচ কাল থেকে হঠাৎ -

- আমার বাবার খুব অসুখ স্যার, বাবা ছাড়া আমার আর কেউ নেই। কাল থেকে অসুখ খুব বেড়েছে।

- কি অসুখ?

- হার্টের ট্রাবল। অনেক দিন থেকে ভুগছেন। আমি কিছুই চিকিৎসা করতে পারিনি। বাবার খুব সামান্য সঞ্চয়, তা থেকে আমাদের কোনরকম চলছিল। বাবা শয্যাগত, আমারও কোন চাকরি ছিলনা। ছোটখাট অফিসে কখনও কখনও কিছুদিন কাজ করেছি, কিন্তু তা ও থাকেনি। আমরা একেবারে শেষ হয়ে যাচ্ছিলাম, এসময় আপনি আমাকে -

- থাক, ওকথা থাক, তুমি এসব কথা আর কারো কাছে বলবে না, কেমন?

মার্সিয়া ঘাড় নাড়ল।

- আর হ্যাঁ, তুমি তো চাকরির সুবিধা অনুযায়ী তোমার বাবার চিকিৎসার খরচ পাবে, তুমি কি জানো না?

- না - অবাক হয়ে তাকায় মার্সিয়া।

- হ্যাঁ, ইচ্ছা করলে তুমি ওনাকে কোনো নার্সিং হোমে ভর্তি করতে পারো। অবশ্য যদি প্রয়োজন হয়। কত টাকা কোম্পানী দেয় এগুলো আমার টিকঠাক জানা নেই, তবে বেশ খানিকটা খরচ ' কভার ' করতে পারবে।

- ইজ ইট? - মার্সিয়ার বিষন্ন দৃষ্টি ক্রমশঃ উজ্জ্বল হয়ে উঠল - আমি জানতাম না স্যার, আমি জানতাম না, কি বলে আপনাকে - দুহাতে মুখ ঢেকে আবার কেঁদে উঠল মার্সিয়া।

মার্সিয়ার ভঙ্গুর কাঁধ কান্নার আবেগে কাঁপে। ওর খাটো চুলগুলি ঘাড়ের কাছে ক্লিপ দিয়ে আঁটা, শেষাংশ ফেঁপে ছড়িয়ে আছে পিঠের ওপর, এলোমেলো কান্নার আবেগে চুলগুলি কাঁপে। কমলা রঙের বড় বড় ফুল ছাপা ছিটের স্কার্ট পরেছে মার্সিয়া, যেন ফুলের ওড়না গায়ে জড়িয়ে, সেই ফুলগুলিও কান্নার আবেগে কাঁপে।

- তুমি দেখছি খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছ - খুব নীচু গলায় বলল সে, ভেতরে ভেতরে সে নিজেও খুব দুর্বল হয়ে পড়ছিল।

- কেঁদোনা, প্লিজ, আমার খুব খারাপ লাগছে। যদি প্রয়োজন হয় আমার থেকে কিছু সাহায্য নিতে পারো, কিছু মনে কোরোনা, কি আছে, পরে শোধ করে দেবে।আমি সরকারবাবুকে বলে দিচ্ছি, উনি সব জানেন, কোম্পানি সুযোগ সুবিধাগুলি কিভাবে দেয় তুমি ওনার থেকে সব জেনে নিয়ে এখনই বাড়ি চলে যাও, কেমন?

পকেটে হাত দিলো সে, ড্রয়ার খুঁজল – কিছু টাকা - এটা রাখো।

মার্সিয়া তাকিয়েই ছিল অপলক।

- ধরো -

কাঁপা কাঁপা হাতে টাকাগুলি নিলো সে - থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ - তার কান্না মেশা অস্ফুট কথাগুলি প্রলাপের মতো - ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন... আপনি দেবদূত...

কি এক আশ্চর্য অনুভব তাকে ঘিরে ভেসে ওঠে ঢেউয়ের মতন। এমন কিছু সে আগে কখনও অনুভব করেনি। সে যেন ঘোরের মধ্যে সারাদিন।

ঘরে ফেরার বেলায় বন্ধু তাকে পর্যবেক্ষণ করতে করতে জিজ্ঞাসা করে - কি হয়েছে তোর? মুখটা অমন লালচে লাগছে কেন?

সে দ্রুত তৎপরতায় নিজেকে গোপন করতে চায়। বুকের আন্দোলন দ্রুততর।

তারপর বিকাল থেকে সন্ধ্যা - সন্ধ্যা থেকে রাত্রি - সারাক্ষণ সেই অনুভব তাকে আলোড়িত করে....

অশ্রুভেজা দুটি চোখ দুটি পদ্মের মতো ভেসে থাকে বুকের ভিতর....

- গুড মর্নিং স্যার।

- গুড মর্নিং। হোয়াট আর ইউ ডুয়িং উইথ দিজ ফ্লাওয়ার্স?

তোড়া ভেঙে ফুল সাজাচ্ছিল মার্সিয়া। ফুলগুলি সামান্য এদিক ওদিক করে একটু উঁচু নীচু করে দেখছিল, মন মতো করে তুলছিল। সম্ভবতঃ আজ ওর আসতে একটু দেরি হয়েছে, এখনও ফুল সাজানো শেষ হয়নি। দরজা খোলার শব্দ শুনে তাকিয়ে অল্প হাসল, বলল - গুড মর্নিং স্যার।

সে তাকিয়ে দেখছিল মার্সিয়ার ঈষৎ উজ্জ্বল চোখ। কাল সারারাত ঘুমের মধ্যে ভেসেছিল ওই চোখ। মার্সিয়ার চোখ দুটি কি সত্যিই বড়ো? না কি রোগা মুখে বড় লাগে? খুঁটিয়ে দেখতে চাইল সে - না, সত্যিই চোখ দুটি বড় আর ভাসা ভাসা। সহসা লজ্জিত হলো সে - এরকম করে দেখা! বলল - তোমার বাবা কেমন আছেন?

- একটু ভাল, কাল নার্সিংহোম এ ভর্তি করেছি। আমাদের বাসার কাছেই। আজ সকালে দেখে এলাম।

সে চেয়ারে বসল - কাল থেকে আমি কিন্তু একটা ভুল করেছি, তোমাকে তুমি বলছি।

- তাছাড়া আর কি বলবেন?

- অবশ্য ইংরেজি ভাষায় এরকম কোনো অসুবিধা নেই - সে হাসল - তাই এতদিন কোনো অসুবিধা হয়নি। আমি অবশ্য জানতাম না তুমি বাংলা জানো।

- বাঃ, আমিতে বাঙালী। আমার মা অবশ্য বৃটিশ। বাবা পূর্ব বাংলার মানুষ। ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন পড়াশোনা করতে, ওখানেই চাকরি পেয়ে থেকে যান আর বিয়ে করেন। পরে এখানে চাকরি নিয়ে চলে আসেন। আমার জন্ম এখানে।

আমার মা যে কি সুন্দর দেখতে ছিলেন! - মার্সিয়ার কণ্ঠস্বর কেমন উদাস হয়ে যায় - মায়ের কত সুন্দর সুন্দর পোষাক ছিল... সেই সব পোষাকে মাকে আরও সুন্দর দেখাত...একটা খুব সুন্দর বাড়িতে আমরা থাকতাম... খুব সাজানো গোছানো... আমার কত পুতুল ছিল, খরগোস ছিল দুটো।

একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল, বলল - তারপর সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল, মা হঠাৎ মারা গেলেন, তারপর থেকেই বাবা আস্তে আস্তে কেমন হয়ে গেলেন, খুব এলোমেলো... চাকরিতেও ঠিকঠাক যেতেন না.... তখন আমার বারো তের বছর বয়স, আমিও অসুখে পড়লাম - প্লুরিসিস - খুব ভুগেছিলাম।

হঠাৎ মার্সিয়া যেন প্রকৃতিস্থ হলো, ম্লান হাসল, বলল - দেখুনতো, কখন থেকে আমার দুঃখের গান গাইছি।

সে শুধু শুনছিল না, অনুভব করছিল। বুকের মধ্যে কি যেন ক্ষরণ, যেন নিঃশ্বাস নিতে ভুলে গিয়েছিল। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল সে, অস্ফুট স্বরে বলল - দুঃখের গান - প্রসঙ্গ ফেরাবার জন্য কথা পাল্টালো, বলল - তোমার বাংলা কথায় কিন্তু একটু অন্য রকম টান আছে।

- ওটা আমার মায়ের থেকে কিছুটা এসে গিয়েছিল। তাছাড়া বাংলা লেখাপড়া আমার বেশী দূর এগোয়নি - মার্সিয়া লাজুক ভঙ্গিতে বলল।

দুজনে কিছুটা চুপচাপ, মার্সিয়া টেবিলের কাছে এগিয়ে এলো, গতকালের কাটাকুটি কাগজ টেবিলে অমনই পড়েছিল, তুলে নিলো, বলল - এগুলি আবার টাইপ করে ফেলি?

- হ্যাঁ - ছোট্ট করে বলল সে।

মার্সিয়া চলে যাচ্ছে। পিছন থেকে ওকে ফুলছাপ ফ্রক পরা লম্বা এক বালিকার মতো দেখায়। তাকিয়ে রইল সে, তার বুকের মধ্যে আবার ভেসে উঠল ভেজা ভেজা দুটি বড় বড় চোখ।

দশ

... ওই দূরে নীল পাহাড়ের কোলে দাঁড়িয়ে আছে বাল্যকাল। সে আমাকে হাতছানি দেয়।কতদিন আমি পাহাড় দেখিনি, কতদিন অঞ্জলি পাতিনি জরনার জলে....কত দীর্ঘ দিন....

.... তিনদিন কেটে গেল এই শান্ত ভূমে। শান্ত সকালে রোজ বারান্দায় বসে দেখি দূরে ওই নীল পাহাড়ের রহস্যময় অবয়ব, মন কেমন করে, ছুটে চলে যেতে সাধ হয়...

শান্ত সকালে বাংলোর বারান্দায় বসেছিল সে। দীর্ঘ দেহ শালগাছের ছায়া ঘেরা ছোট এক পাহাড়ের ওপর এই বাংলো। এর পাদদেশ ছুঁয়ে চলে গেছে হাইওয়ে টাটানগর এর দিকে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন সরকারী এই বাংলোয় জায়গা পাওয়া গেছে। অবশ্য কেয়ারটেকারকে বেশ কিছু দক্ষিণা দিতে হয়েছে। তবে চুক্তি ' অথারাইজড' পার্সন কেউ এসে গেলে ঘর ছেড়ে দিতে হবে। অবশ্য ঘর বেশীই আছে। দেখা যাবে - ভেবে রয়ে গেছে সে। না হলে দুতিনটি ছোটো খাটো হোটেল আছে, কিন্তু সেই হট্টমেলায় -

ট্রেন থেকে নেমে এক সাইকেল-রিক্সাওয়ালাকে ধরেছিল সে - এখানে হাইওয়ের ধারে ছোট পাহাড়ের ওপর একটা বাংলো আছে, তুমি চেন? রিক্সাওয়ালা তাকে ঠিক নিয়ে এসেছে।

এই বেরিয়ে পড়া - এ এক অজ্ঞাতবাস। কাউকেই সে গন্তব্যস্থল জানায়নি। জানানোয় অসুবিধা। বিশেষতঃ সাধুচরণ ও সান্যাল মহাশয় জানলে খুবই অস্বস্তি। আসার সময় সে যদিও সঙ্গে এনেছে বেশ কয়েকটি বই তবু এই তিনদিনে একটুও পড়া হয়নি। সারাদিন প্রকৃতির পাঠ নিতে কেটে যায় বেলা, সন্ধ্যায় বারন্দায় নিশ্চুপ বসে থাকা। ঝিঁঝিঁর ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

দূরে ওই নীল পাহাড়ের কোলে কোথায় আছে সেই বাল্যকালের ঝরনা? তিন দিন ধরে সে বাংলোর লোকেদের জিজ্ঞাসা করেছে, জিজ্ঞাসা করেছে ক্বচিৎ হেঁটে যাওয়া দুএকজন পথচারীকে, কিন্তু কেউই বলতে পারেনি। কেয়ারটেকার বলল - ঝরনা জানিনা, তবে ওই দক্ষিণের মাঠ পেরিয়ে কিছুদূর গেলে আছে

নদী - সুবর্ণরেখা নদী।

অগত্যা সে মাঠ পেরিয়ে প্রথম দিনই পৌঁছেছিল নদীতে। সরু পায়ে চলা পথ, মাঠ পেরিয়ে কয়েকটি মাটির বাড়ীর পাশ দিয়ে গিয়েছে নদীর ধারে, সেখানে পাঁচটি দীর্ঘদেহ শালগাছ পরস্পর শাখা জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর কয়েক পা এগিয়ে ঢালু পথ নেমে গেছে নদী গর্ভে। সেখানে জলের ধারা মৃদুস্রোতে বয়ে যায়। বিস্তৃত নদীগর্ভে জলমধ্যে এখানে ওখানে জেগে আছে বিশাল বিশাল পাথর। ওপারে আবার উঠে গেছে ঢালু পাড় বাঁধের মতন। বাঁধের ওপার দৃষ্টির আড়ালে। নদী বহে গেছে ওই দূরে কোথায় কোথায়। সেখানে আকাশ নদী একাকার।

তিনদিন কাটলো এভাবে - কখনও সেই পাঁচজন গাছেদের কাছে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা, কখনও নদীর পাড়ে সোনালী বালি মাড়িয়ে হেঁটে যাওয়া, কত রঙ-বেরঙের নুড়ি কুড়িয়ে কুড়িয়ে বোঝা ভারী - পুণরায় নদীজলে ফেলে দেওয়া, কখনও স্রোতের ধারে বসে থাকা - এক দৃষ্টে দেখা স্বচ্ছ জল, নীচে সোনালী বালির ঝিকিমিকি, কখনও রূপোলী মাছ ছুটে চলে যায়... একদিন স্রোত পেরিয়ে হেঁটে গেল একটি গ্রাম্য লোক। কতটুকু জল! হাঁটুও ডোবে না। আশ্চর্য সে পায়ে পায়ে এগিয়ে যায়, তারপর নদীবুকে পাথরের ওপর বসে কেটে যায় কতক্ষণ।

কিন্তু আজ এই শান্ত সকালে তার মন বড় ব্যাকুল হয়ে উঠল, সেই ঝরনা, সেই বন, সেই উপত্যকা - উড়ে যাওয়া টিয়া পাখির ঝাঁক... এই পথ দিয়েই তো আসা যাওয়া ছিল। একটাই মাত্র পথ - বাবা বলতেন - এই পথ ধরে চলে যাওয়া যায় কলকাতা...

অস্থির সে পথে নেমে এলো, হাঁটতে শুরু করল। এই বাংলো, এই টিলা - এ যে মনে গেঁথে আছে ছবির মতন! এরই কাছাকাছি কোথাও আছে সেই পথ, যে পথে জীপ গাড়ি ছুটে যেত ওই নীল পাহাড়ের কোলে... হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার ধারে একটা ঝুপড়ি মতো চায়ের দোকান পাওয়া গেল। বেঞ্চে বসে এক ভাঁড় চা চাইল সে। দোকানদার একজন মাঝবয়সী লোক, খরিদ্দার সে ছাড়া আর কেউ নেই।

হাইওয়ের ধারে এটা একটা ছোট গ্রাম। পায়ে চলা পথ চলে গেছে গ্রামের মধ্যে। ওদিকে একটু ভেতর দিকে খেলা করছে কয়েকটি ছেলেমেয়ে। দোকানদারের দিকে না তাকিয়ে সে ওই ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে কথাটা পাড়ল।

- আচ্ছ ওই যে দূরে পাহাড়গুলি দেখা যাচ্ছে ওখানে কোথায় একটা ঝরনা আছে, আপনি জানেন?

এমনিতেই দোকানদার বারবার তার দিকে তাকাচ্ছিল। এমন খরিদ্দার এখানে আসে না কখনো। এখন খরিদ্দারের কথা শুনে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। দোকানদারের দিকে না তাকিয়েও সে বুঝতে পারছিল, অস্বস্তির সঙ্গে কলল - আমি বেড়াতে এসেছি তো!

- ও পাহাড় তো অনেক দূর। অনেক রাস্তাই তো ওদিকে গেছে, তবে ঝরনা আছে কি না বলতে পারব না। এই রাস্তা ধরে আপনি গ্রামের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যান না। খানিকটা হাঁটলে একটা চওড়া রাস্তায় পড়বেন, ওই রাস্তায় লরীটরি যায় ওই পাহাড়ের দিকের জঙ্গলে কাঠ আনতে।হ্যাঁ হ্যাঁ - সে আগ্রহী - ওই বড় রাস্তাটাই আমি খুঁজছিলাম, ওটাতো এই হাইওয়ে থেকেই শুরু হয়েছে?

- হ্যাঁ, আরও মাইলখানেক হাঁটলে আপনি সেই মোড় পাবেন। কিন্তু শুধু শুধু অত ঘুরবার দরকার কি? এই গ্রামের ভেতট দিয়ে গেলেই আপনি ওই রাস্তা পেয়ে যাবেন। কিন্তু ওই পাহাড়ে অতদূর যাবেন কি করে? ফিরতে পারবেন?

চায়ের পয়সা দিয়ে সে ততক্ষণে জোর কদমে হাঁটা শুরু করে দিয়েছে।

. গ্রাম পেরিয়ে পাথুরে মাঠ ফাঁকা ধু ধু, দূরে ওই গাছপলার আভাস, ওদিকে কোথায় বড় রাস্তা? কিন্তু পায়ে চলা পথ এঁকে বেঁকে চলে গেছে। হাঁটতে থাকল সে, আর একসময় সত্যিই পেয়ে গেল লালমাটি আর কাঁকর মেশানো সেই পথ। নিবিড় সবুজ গাছপালার জগতে ওই পথ হারিয়ে গিয়েছে। বুকের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা নিয়ে পথের ওপর দাঁড়াল সে। অস্থির পা আর থেমে থাকতে চাইছে না, তাই তাদের চলতে দিলো সে। দুপাশে শুধুই গাছেদের ভীড়, আর কেউ নেই। বাতাসে শুধুই গাছেদের গন্ধ। রৌদ্র ছায়ায় আলপনা আঁকা পথে সে

আপন মনে হাঁটতে থাকল। স্তব্ধ চরাচরে কখনও কোনো একক পাখির কণ্ঠস্বর।

কতক্ষণ হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে একসময় জঙ্গল হঠাৎ দুপাশে পিছু হটে গেল। পথের দুপাশে বিস্তৃত ধানক্ষেত, ধানক্ষেত ঘিরে প্রহরীর মতো জঙ্গল, অবাক সে দাঁড়িয়ে পড়ল। জঙ্গলের মধ্যে এ এক রূপকথার রাজ্যে পৌঁছেছে সে। কারা বুনেছে এমন শষ্য? কোথায় তারা? সবুজ শষ্যক্ষেত্রে ঢেউ তুলছে বাতাস। এত ভাল লাগছিল তার! দূরের সেই ঝাপসা নীল পাহাড়েরা এখন সবুজ দেখায়, সবুজের মধ্যে লক্ষ্য করলে গাছেদের শরীরের আভাস। বড় উৎসাহ জাগল তার। এতক্ষণ হাঁটার কোনো ক্লান্তি নেই। তার মনে হলো সে এগিয়ে যাচ্ছে না, পাহাড় তার দিকে এগিয়ে আসছে।হাঁটতে হাঁটতে ধানক্ষেত পেরিয়ে গেল। আবার গাছপালা পথের কাছাকাছি। কি আশ্চর্য, এক স্রোতস্বিনী পথের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে।

পথ এখানে কংক্রিটে বাঁধানো। ঢালু হয়ে নেমে আবার উঠে গেছে ওদিকে। পথের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে জল। চটি খুলে হাতে নিল সে, প্যান্ট গোটালো। পায়ের পাতা ডোবা জলের ক্ষীণ স্রোত। নামল সে। কি ঠান্ডা জল! হাতে জল নিয়ে মুখে ঘাড়ে বোলাল, শরীর জুড়িয়ে গেল।

উঠে এসে দেখল ছোট্ট গ্রাম।কয়েকটি মাত্র মাটির বাড়ি। নিকানো দেওয়ালে আঁকা আলপনা। পথের ধারে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে তিনটে গরুর গাড়ি, খুঁটিতে বাঁধা গরু। কয়েকটি মুরগী কি যেন খুঁজছে। প্রথম বাড়িটার বাইরে ঝাঁপ খোলা একটা দোকান, উনুনে বসানো কেটলি। সাগ্রহে দোকানে উঠে এলো।

বাঁশের বেঞ্চে বসে সবুজ শালপাতার ঠোঙায় তেলেভাজা আর মুড়ি খাচ্ছে দুজন কালোকুলো মানুষ। দেখেই খিদে চনমন করে উঠল পাকস্থলিতে। হাত উল্টে ঘড়ি দেখল - এগারোটা। প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা হাঁটছি! ভোজনরত মানুষ দুটির পাশে বসল সে, বলল তেলেভাজা আর মুড়ি দাওতো ভাই,, দাও, এক টাকারই দাও। মুড়ি খেয়ে জল খেয়ে চা খেলো সে, সস্তার সিগারেটও পাওয়া

গেল। দাম মিটিয়ে দোকান থেকে নামল সে, খুব ইচ্ছা হচ্ছিল দোকানদারকে জিজ্ঞেস করে ঝরনার কথা, কিন্তু নিজেকে নিবৃত্ত করল। অন্ততঃ ওই পাহাড়ের কাছ ঘেঁসে পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া যাক।

ধীরে ধীরে পাহাড়ের কাছে। এখন পাহাড়ের গায়ে দীর্ঘ বৃক্ষেরা দৃশ্যমান। রাস্তা এখানে বাঁক নিয়েছে। বাঁকের মুখে যখন সে পৌঁছাল আর সামনে দেখল তার বুকটা ধক্ করে উঠল - ছোট এক পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেছে পাকদন্ডী পথ। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। পাহাড়ের কোলে এখানেও এক ছোট শষ্যক্ষেত্র, পাশে একটা গাছের ওপর বাঁধা একটা ঝুপড়ি ঘর - সব কিছু চিনতে পারল সে, স-ব কিছু। রাতে ওখানে বসে পাহারা দেয় আর ক্যানেস্তারা বাজায় পাহারাদার - এসব ঠিক তেমনি আছে ছোটবেলার মতো। নিস্তব্ধ নির্জন পরিবেশে দাঁড়িয়ে সে বাল্যকালের মতোই ভাবল - এই বনে কোথার আছে সেই হরিণের পাল? কোথায় আছে হাতি ভালুক? ভাবতে গিয়ে বাল্যকালের মতোই শিহরণ জাগল তার।

এখানেই জীপগাড়ি রেখে তারা পায়ে পায়ে হেঁটে যেত পাহাড়ের গায়ে... এগিয়ে চলল সে, পাকদন্ডী বেয়ে পাহাড়ের আরও ওপরে। ডানদিকে নেমে গেছে খাদ, নীচে ঝুমঝুম শব্দ তুলে বয়ে চলেছে নির্ঝরিণী। ছায়া ছায়া অন্ধকারে ঢাকা কি নিবিড় বনভূমি। কেমন এক ভয়, অথচ ভাললাগা। খাদের ধারে দাঁড়াল সে, অনুভব করল প্রকৃতির আলিঙ্গন।

পাকদন্ডী বেয়ে নেমে গেছে পথ।

নামতে লাগল সে। ওই দেখা যায় ছোট্ট গ্রাম, দ্রুত পায়ে - ওইতো, ওখানে ওই সবুজ উপত্যকায় গরু চরাচ্ছে বালকেরা সেই বাল্যকালের মতো। ওই সব বালকেরা একদিন খেলা করেছিল আমার সাথে - ভাবতে গিয়ে হেসে ফেলল সে - তারা তো এখন আমার বয়সী! আচ্ছা, তারা তো এ গ্রামেই বসবাস করে। তাদের কাউকে কি জিজ্ঞেস করলে মনে পড়বে কোনোদিনের সেই খেলার সাথীর কথা? এখানে আমরা তো এসেছি বেশ কয়েকবার। কিন্তু ঝরনার পথ কোন দিকে সে ওই বালকেরা জানে। এখানে তেমন কোনো পথ

দৃশ্যমান নয়। সরু পায়ে চলা পথ জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গেছে ঝরনার কাছে। বালকেরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তাকে দেখছিল। হাতছানি দিয়ে ডাকল সে। ভীরু ভীরু বালকের দল থেকে একটু সাহসী একজন এগিয়ে এলো, একটু তফাতে দাঁড়িয়ে নিরীক্ষণ জরল তাকে।

- আমাকে ঝরনার কাছে নিয়ে যাবি?

- আমি তো গরু চরাচ্ছি।

- যা না, আমি তোর গরু দেখব - আরেকজন বলল -পয়সা দিবে তো?

- হ্যাঁ রে হ্যাঁ, এক টাকা দোবো।

- ই রে, এক টাকা? - পিছনের ছেলেটি শিস টানল - যা রে ভরত যা -

ক্রমশঃ জঙ্গল আরও নিবিড়। বড় বড় গাছের নীচে ঘন হয়ে আছে ছোট ছোট গাছ আর আগাছা, গায়ে আঁচড় লাগে, তারই মধ্যে সরু পথরেখা ধরে চলল তারা, এগিয়ে চলল ক্ষীণ এক শব্দের দিকে।

এখন চারিদিকে ছড়ানো ছিটানো ছোট বড় পাথর, তার মাঝ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে জল, ছিটকে উঠছে ফেনা, বিচিত্র শব্দ উঠছে খল খল, খিল খিল, কুল কুল। এ পাথরে ও পাথরে পা দিয়ে খরগোশের মতো দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বালক ভরত। সে ওর সঙ্গে তাল রাখতে পারছিল না। উঁচু গলায় ও কে ডাকল সে, কিন্তু বাতাসে তীব্র হয়ে বাজছে ঝরনার গর্জন, ও শুনতে পেল না।

অবশেষে তার আকাঙ্খিত ধারা। পাথরে পা সামলে অবাক হয়ে দাঁড়াল সে। চারিদিকে এত ঘন বৃক্ষরাজি! কাউকে আলাদা করে বোঝা যায় না। আর কি নিবিড় ছায়া! ওই ওপরে ঝুঁকে আছে এক বিশাল পাথর, তার ওপর দিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে জলধারা, পড়ছে নিজেরই সৃষ্ট এক জলাশয়ে, আর জলাশয় ছাপিয়ে ছুটে চলে যাচ্ছে পাথরের খাত বেয়ে। তার সুগভীর গর্জন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত বনভূমে। আরও এগিয়ে সে বসে পড়ল একটি পাথরের ওপর, পায়ের কাছে লাফিয়ে উঠে ছুঁয়ে গেল জল। তার বুকের মধ্যে কি আনন্দের ধারা! হারানো রতন খুঁজে পাওয়ার আনন্দ!

রৌদ্রের প্রবেশাধিকার এখানে নিয়ন্ত্রিত। ছায়াঘন পরিবেশে সূক্ষ্ম জলকনা

বাতাসকে করছে সুশীতল। এতক্ষণ তার মনে হলো দীর্ঘ পথ পেরিয়ে আসতে তাকে কি রৌদ্রতাপ গ্রহন করতে হয়েছে। কি যেন নেশার ঘোরে চলতে চলতে সে বিস্মৃত হয়েছিল কষ্ট। ওই শীতল জলে শরীর ডুবিয়ে নিলে - ভাবল সে - ভরত, ও ভরত - ডাক দিলো।

ওদিকের একটা গাছ থেকে কাঠবিড়ালির মতো দ্রুত নেমে এলো ভরত, মুখের মধ্যে কি একটা ফল চিবোচ্ছিল সে, রস টেনে ছিবড়ে ফেলতে ফেলতে বলল - কি?

- এখানে কি গ্রামের লোকজন আসে?

- না

- আমি একটু চান করব?

- হুঁ।

- তাহলে তুই ওই রাস্তার মুখে গিয়ে দাঁড়া।

কি যেন ভাবল ভরত, বড় বড় চোখ করে একটু হাসল, তারপর পাথরে পাথরে লাফাতে লাফাতে চলে গেল বনপথের ওই মুখে যে পথ দিয়ে তারা এসেছে।

পাথরের ওপর রেখে পোষাক আসাক নগ্ন সে নেমে এলো জলাশয়ের ধারে সেখানে জল অনেক শান্ত। সাবধানে পা ডোবাল - হাঁটু জল, বসল, আর তখনই তার মনে হলো এতক্ষণে ঝরনা তাকে আপন করে নিলো।

এই নগ্ন শিলাস্তর, নগ্ন বৃক্ষ সকলের মাঝে নগ্ন ঝরনাধারার আলিঙ্গনে নগ্ন সে অনুভব করছিল কি এক অনাস্বাদিত অনুরণন - কত দীর্ঘ যুগ ধরে সৃষ্টির কোন আদিকাল থেকে এই নগ্ন প্রকৃতি সবুজ সজীব, নগ্ন শরীরের এক আদিম মানুষ আমি তার স্পর্শ পেলাম...

অঞ্জলি ভরে জল তুলে তুলে সে স্নান করল অনেকক্ষণ, জল ছিটিয়ে খেলা করল শিশুর মতন।

ঘামে ভেজা গেঞ্জি ধুয়ে গা মাথা মুছল, পোষাক পরল তারপর প্রশস্ত এক শীতল পাথরে শুয়ে পড়ল। পাশে এসে দাঁড়াল ভরত, বলল - দিন থাকতে

জঙ্গল পাহাড় পেরিয়ে যেতে হবে, সন্ধ্যা হলে জানোয়ার বেরোয়। ভরতকে কয়েকটা টাকা দিল সে, বলল সকলে ভাগ করে নিবি। পাথরে পাথরে পা ফেলে ফিরে যেতে যেতে শেষ বারের মতো মুখ ফিরিয়ে দেখল ঝরনাকে। বুকে কেমন এক কষ্ট, নীচু হয়ে কুড়িয়ে নিলো একটা নুড়ি তারপর ফিরে চলল।ভরতকে কয়েকটা টাকা দিলো, বলল সকলে ভাগ করে নিবি।

পাকদন্ডীর বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে শেষবার ফিরে তাকাল, বালকেরা দাঁড়িয়ে আছে। হাত নাড়ল সে। ওরাও হাত নাড়ল। পাহাড়ে ঘনায়মান ছায়ার মতো কেমন এক বিষন্নতা তাকে আচ্ছন্ন করছিল।

এগারো

দীর্ঘ ছুটির পর আজ আবার বিশাল অফিস বাড়িটা প্রাণচঞ্চল। ছুটির বন্ধে নতুন রঙ পড়েছে দেওয়ালে দেওয়ালে, দরজাগুলি পালিশ করা হয়েছে পরিস্কার করা হয়েছে কার্পেট - সব মিলিয়ে একটা উজ্জ্বলতা। গাড়ি থেকে নেমে যখনই সে দরজার পাল্লায় হাত ছুঁইয়েছে তখনই কেমন এক প্রশান্তি বুকের মধ্যে। ভেতরে ঢুকেই সাননে রিসেপয়ান কাউন্টার, ফুলদানিতে নানন ফুলের মধ্যে থেকে রজনীগন্ধার ঋজু শীষেরা খুবই সুগন্ধ ছড়িয়েছে ঘরে। দেওয়ালে নতুন নীলাভ রঙ, মেঝেয় গাঢ়।। খয়েরী রঙের কার্পেট - এসবের মধ্যে এক ভাললাগা ছড়িয়ে গেল।

কাউন্টারে মিস্ হালদার হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে উঠে দাঁড়ালে সে ও হেসে নমস্কার জানাল।

ওর পরনে বাসন্তী রঙের জমির ওপর কালো বুটিদার শাড়ি, ফর্সা মুখ আর হাত দুটির বাসন্তী রঙের আভা গায়ের রঙকে আরও উজ্জ্বল করেছে - এক মুহূর্তে এসব দেখা আর ভাবনা মনে মনে।

- আপনাকে ধন্যবাদ জানানো হয়নি - মিস হালদার বললেন - ছুটির ঠিক আগের দিন বিকালে ম্যাগাজিন হাতে পেলাম, একেবারে ' কভার পেজ' এ আপনি আমাদের বসিয়ে দিয়েছেন।এতো সুন্দর হয়েছে! এতোটা আশা করিনি।

সে খুব উদার হাসল, বলল - প্রথমত কথায় আছে লেডিজ্ ফার্ষ্ট, দ্বিতীয়ত এই অফিসে ঢুকলে প্রথমেই কাদের দেখা যায়? তাই ম্যাগাজিনের প্রথমেই আপনারা থাকবেন এটাই স্বাভাবিক।

- ধন্যবাদ, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

সে একটু অস্বস্তি বোধ করল, বলল - আপনার আনন্দে আমিও আনন্দিত। ....কি জানি, আজ সকাল থেকে কেমন এক উদ্দীপনা! সকাল থেকে কেন? এতগুলি দিন বাইরে ছিলাম, ফিরেছি গতকাল সন্ধ্যায়, সেই তখন থেকেই ঘরের পরিচিত সবকিছু ভাল লাগছিল না কি? আর যখন মনে হলো আগামীকাল অফিস যাবো তখনই মনটা খুশি খুশি হয়ে ওঠেনি কি? তারপর সকাল থেকে সে খুশি তীব্রতর। আসলে ছুটির শেষ দিনগুলি আমাকে ক্রমশ বিষন্ন করছিল। অথচ সেই শান্ত বনভূমি....সেই নীল পাহাড়.... পাখিদের ডাক... ঝরনা, নদী.... সেই স্নিগ্ধ স্নান....কী গভীর আনন্দ।

কিন্তু তারপর? একদিন, দু'দিন, তিনদিন - সেই নির্জন বাংলোয় একা - কি যেন এক শূন্যতা - নিঃসঙ্গ লাগছিল।

ফিরে এসে আবার নতুন ভাললাগা। অবচেতন মন কি যে চায়! ক্লান্তিতে ক্ষয় হতে হতে আমি চাইছিলাম ছুটির মুক্তি, আবার মুক্তির মাঝে ছুটে গিয়ে -

সে তার চেম্বারের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। এ ঘরেও নতুন রঙ। চারিদিক তাকিয়ে দেখল সে, ফুলদানিতে ফুলের সুন্দর সাজ - খুবই ভাল লাগছে সব কিছু। চেয়ারে বসল। টেবিলের ওপর একগাদা চিঠিপত্র রেখে গেছে বেয়ারা, নেড়েচেড়ে দেখল - অধিকাংশই বিজয়ার শুভেচ্ছা। কার্ড পাঠিয়েছে বিভিন্ন পূজা কমিটি এবং সংস্থা, ব্যক্তিগত কিছুও আছে। সে একটা একটা খাম খুলে ছবিগুলি দেখতে লাগল। খুব ভাল লাগছিল তার। শিশুর খুশির হাসি তার মুখমন্ডলে। কার্ডগুলি দেখতে দেখতে সে দুএকবার বন্ধ দরজার দিকে দেখল।

এক সময় কার্ড দেখা শেষ হয়ে গেল। কার্ডগুলি গোছাতে গোছাতে ভাবছিল - মার্সিয়া এখনও এলো না। অথচ ঘরে ঢোকার সময় আমার মনে কি তীব্র আকাঙ্খা ছিল না? এই দীর্ঘ বিরতির পর নিত্যকার অভ্যাস মতো ঘরে ঢোকা

মাত্র মার্সিয়া হাসি মুখে গুডমর্নিং জানাবে ওই টাটকা ফুলগুলির মতো...
আমি মার্সিয়ার জন্য অপেক্ষা করছি... অনেকক্ষণ থেকে আমি তাকে দেখার জন্য উদগ্রীব। ঘড়ি দেখল - কি ব্যাপার? ও কি ভুলে গেছে আজ অফিস
খুলছে? এত দেরী কেন? না কি এসেছে, ওর ঘরে বসে আছে! কিন্তু তা কি করে হয়? ও আগেই আসে, আমি ঢোকা মাত্র আমাকে গুডমর্নিং জানিয়ে তবে... কিন্তু ফুলগুলি সাজাল কে? তবে কি - সে উঠে দ্রুত ঘরের ও প্রান্তে - ও ঘরের দরজা খুলে মুখ বাড়ালো -

তার ছোট্ট ঘরে টাইপ মেশিনের সামনে চুপ করে বসে আছে মার্সিয়া, দরজা খোলার শব্দে শুধু মুখ তুলে তাকিয়েছে।

মুখ তুলে তাকিয়েই মুখ নীচু করে নিলো মার্সিয়া, উঠে দাঁড়াল, মুখ নীচু করেই বলল - গুড মর্নিং স্যার - কিন্তু তার গলার স্বর প্রায় শোনাই গেল না।

অবাক হয়ে তাকিয়ে সেi হালকা নীল রঙের ম্যাক্সির মতো ঘাগরা পরেছে মার্সিয়া, বাহু মূলে কুঁচিয়ে ফাঁপানো হাতা, কোমরে একটা সোনালী রঙের ফিতে আলগোছে ফাঁস দেওয়া, তারপর ঘাগরার মতো পোষাক নেমেছে পায়ের পাতা ছুঁয়ে মেঝেয় ছড়িয়ে আছে, আর মেঝে থেকে যেন পোষাক বেয়ে উঠে এসেছে একটা ফুলের ঝাড় - নানান রঙের ছোট বড় ফুলের আর পাতার ঝাড় সুতোর কাজ দিয়ে তৈরি। এমন এক সুন্দর পোষাক পরে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে মেয়ে, তার এলো চুল ঘাড়ের কাছে কোমরেরই মতো একটা সোনালী ফিতেয় ফাঁস ।

সে অবাক হয়ে দেখছিল... ছোট বেলায় তার অনেক বই ছিল, অনেক দেশ বিদেশের গল্পের বই, সেই সব বইতে অনেক সব রঙীন ছবি ছিল, তার মধ্যে একটা পরীর ছবি ছিল, তার মনে হলো সেই ছবির পরী কোথা থেকে উড়ে এসেছে। পরী? না না, সিন্ডারেলা! হ্যাঁ, সিন্ডারেলা, মনে পড়েছে! সেই গল্পে যাদু কাঠির ছোঁয়ায় সিন্ডারেলার জীর্ণ পোষাক যখন সুন্দর হয়ে উঠেছে, সে তখন আট ঘোড়ার গাড়ি চড়ে রাজবাড়ীতে যাবার জন্য প্রস্তুত, সেই একটা ছবি ছিল তার গল্পের বইতে - সেই ছবি এখন জীবন্ত সামনে দাঁড়িয়ে! না কি ছবিই?
- মার্সিয়া - সে ডাকল - কাম হিয়ার - সে দরজা ছেড়ে এ ঘরে চলে এলো।

মার্সিয়া জড়ানো পায়ে এঘরে এসে দাঁড়াল, রোগা রোগা হাত দুটি বুকের কাছে তুলে নিল। ওর শীর্ণ মুখে কেমন ঊজ্জ্বলতার ছোঁয়া।

সে সহজ হতে চেষ্টা করছিল কিন্তু কেমন এক চঞ্চলতা মনের মধ্যে।

- কেমন আছ মার্সিয়া?

- ভাল - মুখ তুলল মার্সিয়া - আপনি ভাল আছেন?

সে মাথা নাড়ল, বলল - খুব সুন্দর হয়েছে তোমার পোষাক।

মার্সিয়া অল্প হাসল, তাকাতে গিয়ে চোখ কেঁপে গেল তার, বলল - আমার তো একটাও দামী পোষাক নেই, এটা ছুটির সময় বানালাম, এই ফুলের কাজটা আমি নিজ হাতে করেছি।

- তাই না কি? - য়ে অবাক, চোখ নামিয়ে ফুলের কাজ দেখতে দেখতে সে উচ্ছ্বসিত - সত্যি সুন্দর হয়েছে!

- বাবা বকছিলেন - মার্সিয়া মুখ ভারি করে বলল - বলছিলেন - তোমার এখন হিসেব করে চলা উচিত। ঠিক কথা, কিন্তু একটু একটু সাধ থাকবে না? ইচ্ছা করে না?

- ঠিকই তো! - সে এভাবে বলল যেন ছোট্ট মেয়ের খেলার সাথী, বলল - যাক তুমি এক কাজ করো, এই কার্ডগুলো পিন দিয়ে সুন্দর করে বোর্ডে আটকাও। দেওয়ালে সবুজ ফেল্ট মোড়া বোর্ড দেখিয়ে দিলো সে, বলল - ট্যুরে বেরিয়েছিলেন মিস্টার সান্যাল, আজ অফিসে যোগ দেওয়ার কথা, আমি আসার আগে উনি কি ফোন করেছিলেন?

- না, কেউ ফোন করেননি।কে মিস্টার সান্যাল?

- ডাইরেকটর সেলস্, তুমি এখনও ওঁকে দেখোনি, আচ্ছা, ফোন করছি।

- গুডমর্নিং, আপনি ফিরেছেন। আশা করি ভাল আছেন। আমি কি আপনার কাছে আসব? ও, আপনি আসবেন? কেন? আচ্ছা, আসুন। হ্যাঁ, আমি ভাল আছি। - ফোন রাখল সে, টেবিলের অন্যান্য চিটিগুলি খুলতে শুরু করল।

- তোমার ওই পোষাক বানালাম কথাটা কিন্তু অদ্ভূত।

- কেন? -বোর্ডের ওপর কার্ড আঁটতে আঁটতে ফিরে তাকাল মার্সিয়া।

- ওটা পুরোপুরি পূর্ব বাঙলার কথা - ওই য়ে - বানালাম - আমরা পশ্চিম বাঙলার মানুষ বলি তৈরি করলাম।

- হ্যাঁ, তা হতে পারে - মার্সিয়া হাসল – আমার কথা সবটুকুই তো বাবার কাছে শুনে শেখা। সেই ছোটবেলা থেকে বাবা শেখাতেন, আর মা মারা যাবার পর থেকে আস্তে আস্তে আমাদের বাঙলায় কথা বলাই অভ্যাস হয়ে গেছে।

তখন দরজা খুলে ঢুকে পড়েছেন মিস্টার সান্যাল, তিনি অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন, তারপর - কি ব্যাপার? কে এই বাঙালি মেনসাহেব? তোমার নতুন স্টেনো না কি? মে আই নো ইয়োর নেম ম্যাডাম?

মার্সিয়া জড়োসড়ো, আলতো গলায় বলল - মার্সিয়া বিশ্বাস।

- আ! এ লেডি অফ্ ফেথ্! ভেরি গুড! - একটুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, বললেন - ইউ আর নাইস অলসো এ্যাজ ইয়োর নেম।

মার্সিয়া কোনক্রমে একটু হাসল, জড়ানো গলায় বলল - থ্যাঙ্ক ইউ - তারপর ঢোক গিলে বলল - মে আই গো নাউ?

- ও ইয়েস ইয়েস, উই হ্যাভ সাম্ প্রাইভেট টক্, এন্ড সী, ডোন্ট বি এফ্রেড, দো আই লাইক হান্টিং বাট দ্যাট ইজ্ এ্যানিম্যাল হান্টিং, নট লেডি হান্টিং, দ্যাট ইজ ফর ইয়াং মেন, নট ফর ওল্ড মেন লাইক মি। - তাঁর গুরুগুরু হাসিতে ঘর কেঁপে উঠল।

মার্সিয়া ঘর থেকে পালিয়ে বাঁচল।

- তোমার ঘরে এলাম ও কে দেখার জন্যই, যাক, মনে হচ্ছে জলে পড়নি, এতো ভয় পাচ্ছিলে কেন?

সে একটু হাসতে চেষ্টা করল।

- হ্যাঁ, জরুরি কথাটা হলো তোমার একবার আমাদের সব ফ্যাক্টরি আর অফিসগুলি ঘোরা দরকার। এবারের ট্যুরে আমার এটা মনে হয়েছে। জনসংযোগ বিভাগের প্রধান হিসেবে তুমি দেশের অন্যান্য বিভাগ গুলিতে মোটেই জনসংযোগ করনি। এটার দরকার আছে। তাছাড়া দিল্লিতে যে শিল্পমেলায় আমরা যোগ দিচ্ছি তাতে সমস্ত ফ্যাক্টরিগুলিরই বিশেষত্ব তুলে ধরা

দরকার। সেজন্য সব ফ্যাক্টরীতে গিয়ে খুঁটিনাটি বিষয়গুলি তোমার দেখা দরকার। পাঞ্জাব দিল্লি, ওদিকে বম্বে, হায়দ্রাবাদ, মাদ্রাজ - বেশ কিছুদিন সময় লাগবে। গুছিয়ে একটা প্রোগ্রাম আমি তোমাকে সাজিয়ে দেবো।

বারো

.... বাইরের ঘরে কলিং বেলটা যেন বাজল মনে হলো? সাধুদা কি করছে?

এভাবে সে শুয়েছিল - সারা গায়ে অসহ্য ব্যথা, আর মাথার মধ্যে যেন কে হাতুড়ির ঘা দিচ্ছে। অনেকক্ষণ থেকে চোখ বুজে ছিল সে, তন্দ্রা না কি আচ্ছন্নতা - আর এরকম একটা যন্ত্রনা মাথার মধ্যে।

বাইরের ঘরে কলিং বেলটা বাজল যেন? হালকা আওয়াজও মাথার মধ্যে ঝনঝনিয়ে উঠছে। সে পাশ ফিরে শুলো। এখন মাথার মধ্যে ঝিঁঝিঁর ডাক, ঘুম ঘুম ভাব নামছে ধীরে ধীরে.... একটা পাহাড়ের পথ ধরে নামছে, চারিদিকে গাছ আর গাছ... ডান পাশে খাদ, অনেক নীচে বয়ে চলেছে নদী... তার ঝুম ঝুম শব্দ, না কি ঝিঁঝিঁর ডাক...হঠাৎ একটা কাক ডাকল,ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে চাইল আর গড়িয়ে পড়ে গেল খাদে, তাড়াতাড়ি কিছু আঁকড়ে ধরতে চাইল।

চোখ মেলে দেখল বিছানার চাদর আঁকড়ে ধরেছে সে, তখন আবার বাইরের ঘরে যেন কলিং বেলটা একটুখানি বেজেই থেমে গেল। সাধুদা কি শুনতে পাচ্ছে না? কে যেন ডাকছে। আমি উঠতে পারছি না, আঃ -

ইদানিং রোজই সকালে বেড়াতে বের হয় সে। একটা প্রসন্ন ইচ্ছা তাকে রোজ সকালে বাইরে নিয়ে আসে। একটা গভীর প্রশান্তি ছড়িয়ে থাকে সারাদিনের কাজে। ধীরে ধীরে নিত্যদিন সে এক প্রশান্তির জগতে প্রবেশ করছিল। সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরে ব্যায়াম, ব্যালকনির গাছপালাগুলির একটু পরিচর্যা করা, এভাবে অন্ধকার গাঢ় হয়ে এলে পড়ার ঘরে চলে যাওয়া, তারপর রাতে নিরবচ্ছিন্ন ঘুম তাকে সযত্নে ঘিরে রাখে। তারপর খুব সকালে ঘুম ভাঙলে একটা শিথিল আবেশ নিয়ে কিচুক্ষণ বিছানায়, তারপর পরিচ্ছন্ন হয়ে বেরিয়ে পড়া। শীত পড়তে শুরু করেছে। ঘাসের বুকে আর গাছেদের পাতায় পাতায়

জমে থাকে শিশির। বয়স্ক মানুষেরা হালকা শীতের পোষাক পরে বেড়াতে বের হন। সে কিন্তু এখনো তার পাজামা পাঞ্জাবীতেই সহজ বোধ করে।

রোজই সেই ছোট্ট মেয়েটি আর তার দাদুর সাথে দেখা হয়। হাসির সুপ্রভাত জানিয়ে তারা পরস্পরকে অতিক্রম করে। সেদিন ছোট্ট মেয়েটি বলল - এই, তুমি এতো পাতলা জামা পরে বেড়াতে বেরিয়েছ কেন? অসুখ করবে যে। ঠিক সেদিনই ম্যাজমেজে ভাব তার শরীর জুড়ে। তারপর রাতে জ্বর এলো। জ্বর আজ দ্বিতীয় দিন। এখন বিকাল। তাপহীন সোনালী রোদ পশ্চিমের জানালা দিয়ে তেরছা হয়ে এসে পড়েছে মেঝেতে। সে চোখ বুজে শুয়ে আছে, মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে।

- বাইরে একজন মেমসাহেব এসেছেন - জানাল সাধুচরণ।

সে চোখ মেলল - কে?

- একজন মেমসাহেব, বলছেন অফিস থেকে এসেছেন।

কে এলো? - সে চমকে উঠল, কেন এলো? - সে উঠে বসতে চাইল।

- উঠবার দরকার কি? এখানে ডেকে আনি না।

ধীর পায়ে এসে দাঁড়াল মার্সিয়া। বিকালের সোনালী রোদ্দুর জড়িয়ে গেল তার গায়ে। কমলা রঙের ফুলছাপ স্কার্টে ঘাড়ের একপাশে আর গালের একপাশে লেগে গেল রোদ্দুরের ছোপ। দেখতে দেখতে সে দৃষ্টি ওপাশে পশ্চিমের জানালার দিকে সরিয়ে নিলো। সূর্য আকাশে রঙের কারুকার্য এঁকেছে - একটা সোনার পাহাড়, পাহাড়ের গা ছুঁয়ে উড়ে যাচ্ছে যেন হাঁসের পাল - দেখতে দেখতে তার যন্ত্রণা ক্ষীণ। একটু ভাল লাগা যেন বুকের মধ্যে। ঈষৎ হাসল সে, বলল - বোসো মার্সিয়া।

সাধুচরণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল ওধারে, এগিয়ে এলো, বেতের চেয়ারটা টেনে এনে দিলো বিছানার কাছে।

- জ্বর হয়েছে? - বসতে বসতে বলল মার্সিয়া, ওর কণ্ঠ মায়ায় ভরা।

সে ঘাড় নাড়ল।

-খুব কষ্ট?

- ছিল, এখন একটু কম।

- জ্বর হলে খুব কষ্ট। আমি তাই কত সাবধানে থাকি।সেই ছোটবেলায় একবার প্লুরিসিস হয়েছিল, তারপর থেকে ডাক্তারবাবু বলেছেন একদম ঠান্ডা লাগাবে না। আপনি নিশ্চয় ঠান্ডা লাগিয়েছেন।

- তা একটু।

- খুব অন্যায় - অনুযোগে কণ্ঠ ভারি করে মার্সিয়া।

- তাই বলে তোমার মতো অতো সাবধান হওয়া যায় না। তুমি তো এর মধ্যেই গায়ে সোয়েটার জড়িয়ে সকালে অফিসে আসছ দেখছি।

- সাবধানে থাকলে যদি অসুখ না করে তাহলে সাবধানে থাকাই ভাল।

- তা তোমার সোয়েটার কোথায়?

- ব্যাগে আছে। ওটা আপনার বাইরের ঘরে রেখে এলাম। একটা ফাইল এনেছি। বিশেষ কিছু না, আজ সকালে মিস্টার সান্যাল আপনার খোঁজ করছিলেন। বললাম আপনি অফিসে আসেননি, ফোন করে জানিয়েছেন অসুস্থ। একটু আগে উনি আমার কাছে এসে এই ফাইলটা দিলেন আর গাড়ি করে পাঠিয়ে দিলেন। অসুস্থতার মধ্যে আপনাকে ডিস্টার্ব করা কিন্তু অন্যায়।

- বাঃ! তুমি দেখছি ডাইরেক্টরের কাজের সমালোচনা করছ। তোমার চাকরি করার বুঝি ইচ্ছা নেই?

মার্সিয়া কথা বলে না, শুধু অনুযোগের অভিব্যক্তিতে ঘাড় বাঁকায়।

ওর অভিব্যক্তি দেখে বুকে কি যেন শিরশির অনুভব। আনমনে বলল - দেখি কি ফাইল।

- আপনি নাকি বাইরে যাচ্ছেন, ইন্ডিয়া ট্যুরে? - ফাইল এগিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল মর্সিয়া।

- হ্যাঁ।

আঙুল ধরে ধরে কি যেন গুনল, তারপর বলল আর মাত্র তিনদিন বাকি দেখছি।

আপনার প্রোগ্রাম রেডি, সেই সব কাগজপত্র। এখান থেকে প্রথমে যাচ্ছেন দিল্লি, প্লেনের টিকিট। কিন্তু আমার তো মনে হয় আপনার প্রোগ্রাম পেছিয়ে দেওয়া উচিত। তিনদিনের মধ্যে আপনি কি করে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবেন?

সে স্থির দৃষ্টিতে একটু তাকিয় রইল, বলল - দেখ মার্সিয়া অসুখ বিসুখ আমার বিশেষ করে না, করলেও আমি ওটাকে জোর করে হঠিয়ে দিই। ছোটবেলা থেকে হোস্টেলে থেকেছি, জ্বরটর হলে দাঁতে দাঁত চেপে চুপচাপ গোপন করে যেতাম, দিব্যি সেরেও যেতাম। সামান্য ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে, একটু ওষুধ খেয়েছি, কালকের মধ্যেই সেরে যাবে। ও হো, তোমাকে একটু চা খাওয়ানো উচিত, সাধুদা -

- না না - প্রবল আপত্তি জানাল মার্সিয়া।

- আমারও একটু চা খাওয়া দরকার, বলল সে, সাধুদা আমাদের একটু চা খাওয়াবে?

- জল বসিয়েছি - সাধুচরণ এসে বলেই আবার চলে গেল।

- আমার কিন্তু চলে যাওয়া উচিত, আপনি চুপচাপ বিশ্রাম নিন, এরকম অসুস্থ শরীরে কখন থেকে নানান কথা আর কথা -

মার্সিয়ার চিবুকে গলায় আর চুলে সোনা রোদ ছুঁয়ে আছে, সেদিকে চোখ রেখে সে চুপচাপ। গোধুলি আলোর ছোঁয়ায় ওর মুখে আশ্চর্য ঔজ্জ্বলতা। আগের সেই শীর্ণ চেহারায় ওর সামান্য পরিবর্তন এসেছে। একটু লাবণ্য ছুঁয়ে ছুঁয়ে থাকছে। দেখতে ভাল লাগছিল তার। এভাবে দেখতে দেখতে উদাস গলায় বলল - অসুস্থ মানুষের কাছে কেউ থাকতে চায় না।

- না না, আপনি এ কথা বলবেন না - মার্সিয়া যেন আর্তনাদ করে উঠল, ওর স্বাভাবিক নীচু কন্ঠস্বর অল্প একটু উচ্চগ্রামেই কেমন তীক্ষ হয়ে ভেঙে গেল - আমি ওভাবে বলিনি, না, বলিনি।

সে খুব বিচলিত, কথাট মার্সিয়াকে এতখানি ধাক্কা দেবে সে ভাবেনি।

- এত সিরিয়াসলি নিও না মার্সিয়া - সে যেন ক্ষমা প্রার্থী এভাবে বলল - আমি এনমই বললাম।

সাধুচরন চা নিয়ে এলো, বিস্কিটের প্লেট, ছোট্ট টিপয় এনে ওগুলি রাখল। ফিরে বসল মার্সিয়া, নিজেই চা ঢালল, দুধ মেশাল, চিনি দিল, জিজ্ঞেস করল না তার কাপে কতটুকু চিনি দেবে।

চুপচাপ চা খাওয়া। কেউই কথা বলছিল না। মার্সিয়া জানলার বাইরে ওদিকে কোথায় দৃষ্টি ভাসিয়ে দিয়েছে, ওর মুখে বিষন্নতার ছোঁয়া, কেমন মায়া লাগছিল তার।

চা খেয়ে কাপ নামিয়ে রাখল মার্সিয়া, একটা দীর্ঘশ্বাস, - আমি যাই - বলল, উঠে দাঁড়াল, দরজার দিকে না গিয়ে পশ্চিমের জানালার দিকে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল।

সে অবাক হয়ে দেখছিল....পশ্চিমের আকাশে তখন ডুবন্ত সূর্যের একটুখানি মাথা জেগে, সোনা রঙে মিশেছে গাঢ় লাল আভা, সেদিকে তাকিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে মার্সিয়া বুকে ক্রশ আঁকল, মাথা নীচু করে অস্ফুটে কি যেন বলল। ওর ঠোঁট নাড়া দেখছিল সে, কিছু শুনতে পেল না।

প্রার্থনা শেষে ও ফিরে দাঁড়াল, অপলক চোখে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত, তারপর হঠাৎই বেরিয়ে গেল।

মার্সিয়া - সে ডাকতে চাইল - কিন্তু পারল না।

অন্ধকার নেমেছে অনেকক্ষণ। সাধুদা জানালাগুলি বন্ধ করে দিয়ে গেছে। ঘরে আলো জ্বালতে গেলে সে নিষেধ করেছিল। নিবিড় অন্ধকারে চুপচাপ শুয়ে কি যেন ভাবছিল, কিন্তু কি ভাবছিল নিজেই জানে না।

এভাবে কতক্ষণ সময় গেছে জানা নেই, একসময় পদশব্দ, ঘরে আলো জ্বলল। বন্ধ চোখ খুলল সে - সামনে দাঁড়িয়ে মিস্টার অনন্ত সান্যাল।

- কেমন আছ? - মার্সিয়ার ফেলে যাওয়া চেয়ার টেনে বসলেন তিনি।

- অনেক ভাল।

- ডক্টর এসেছিলেন?

- হ্যাঁ।

- কি হয়েছে?

- কিচু না, সামান্য ইনফ্লুয়েঞ্জা।

- তাহলে আশা করি প্রোগ্রামের কোনো হেরফের করার দরকার নেই?

- না না, তাছাড়া প্রোগ্রামের জন্যই তো ডাক্তার দেখালাম, ওষুধ খেলাম, নইলে দরকার ছিল না।

- যাক্ - তিনি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন, চেয়ারে গা এলিয়ে বসলেন, হাঁক দিয়ে বললেন - ওহে সাধুচরণ, আমার জন্য কড়া করে কফি বানাও তো হে! - তারপর বড় বড় চোখ করে বললেন - লেডি অফ্ ফেথ্ কি এসেছিলেন?

সে ভুরু কোঁচকাল, ছোট্ট করে বলল - হ্যাঁ।

- বাপরে বাপ, তোমার যাওয়া পেছিয়ে দেওয়ার জন্য সে তো একেবারে - দুরন্ত হাসিতে তাঁর কথা অসমাপ্ত রয়ে গেল।

তেরো

বুকের ভিতর এ্ উষ্ণ প্রস্রবণ
তুমি কি ছুঁয়েছ তার উৎস মুখ

এরকম মনে হতো
বাতাস দীর্ঘবেলা থমকে আছে
গাছের পাতাটুকুও
কাঁপে না
এভাবে একাকী
গভীর নৈঃশব্দ ঠেলে চলতে চলতে
ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ হয় শুষ্ক শিলাভূমি....
তুমি কি ছুঁয়েছ সেই শ্রান্ত বুক

আসলে এসব অজান্তে ঘটে যায়...
দুলে যায় অরণ্যের হাওয়া....
গাছেরা মর্মরিত হয়....
পাথরের বুকে
উষ্ণ নির্ঝর নামে
তুমি কি ছুঁয়েছ সেই উৎস মুখ

এখানে সারক্ষণ সর্বচরাচরে সমুদ্রের গান। ঘরে কিংবা বাইরে, সচেতন বা অন্যমনে, ঘুমে কিংবা জাগরণে, যে ভাববেই হোক সারাক্ষণ চেতনায় বাজে সমুদ্রের তীব্র ধ্বনি, আশ্চর্য বলিষ্ঠ আর ছন্দময় গান....

সে এখানে আছে তিনদিন - ভারতের শেষ প্রান্ত কন্যাকুমারীর মাটিতে বালিতে পাথরে আর সমুদ্রের বিস্তারে সে নিজেকে মেলে দিয়েছে কুড়িয়ে নিতে বিশ্রাম ও আনন্দ।

প্রায় একমাস ধরে সে ব্যস্ত ঘুরেছে এক অফিস থেকে আরেক অফিস, এক ফ্যাক্টরী থেকে আরেক ফ্যাক্টরী, এক শহর থেকে আর এক শহর। শেষ শহর মাদ্রাজ - তারপর কাজ শেষে সে চলে এসেছে এখানে, এই প্রান্তভূমে যেখানে তিন দিকে বিশাল জলরাশি - তিন সমুদ্র আর মহাসমুদ্রের মিলনস্থল।

এই একমাস - এই দীর্ঘ সময় সে কাটিয়েছে মৌনব্রতে। সারাদিনের অফিসিয়াল কথাবার্তা - সে তো কথা নয়, অনুভবহীন কিছু শব্দ মাত্র। বাকি সমস্ত সময় শুধু নিজের গভীরে কথা বলা.... এভাবে তার বুকের মধ্যে জন্ম নিয়েছে এক উষ্ণ প্রস্রবণ...
নির্ঝরিনী। সে জলধারা বয়ে গেছে সমস্ত শরীরে.... নির্ঝরিনীর দুই পাশে বেড়ে উঠেছে ফুলের বন, নির্মল বাতাসে দুলে উঠছে সুগন্ধ.... জন্ম নিয়েছে কবিতা....

এখন রাত্রি গভীর। টুরিস্ট লজের দোতলার ঘরে সে বিছানায় আধশোয়া। তার সামনে খোলা ডায়েরী। ডায়েরীর পাতায় কিছু লিখতে গিয়ে থমকে ছিল সে, আনমনে তাকিয়েছিল শব্দে গেঁথে রাখা অনুভবে। বাইরে সমুদ্রের উত্তাল

গর্জন, বন্ধ জানালা দরজা সে গর্জন স্তিমিত করতে পারছিল না। সে উঠল, বারান্দার দরজা খুলল, অমনি ঝাঁপিয়ে পড়ল পাগল হাওয়া। এলোমেলো করে দিল চুল, পোষাক-আসাক। বারান্দার রেলিংএ ভর দিয়ে দাঁড়াল, অস্ফুট উচ্চারণে বলল - বুকের ভিতর এক সমুদ্র উতল, তুমি ছুঁয়েছ তার অন্তঃস্থল....

অন্ধকারের আড়ালে অনন্ত সমুদ্র গম্ভীর গর্জনে তাকে সাড়া দিল। ' এ কি আকুলতা ভুবনে ' - মনে মনে বলল সে - এ কি আকুলতা....

সকালে ঘুম ভাঙতে না ভাঙতেই ভেতর থেকে কার যেন ব্যস্ত তাগিদ। তাগিদদার যেন সারারাত বসেছিল শিয়রে তার ঘুম ভাঙার অপেক্ষায়, ঘুম ভাঙতেই বলে উঠল - নাও নাও, এবার গোছাও।

যেই মাত্র মনে হলো ফেরার কথা অমনই আনন্দময় এক বাতাসের দমকা ঝাপট ; হুড়োহুড়ি ছুটোছুটি করে সে বাতাস তাকে বিপর্যস্ত করে দিল।

কিছু পোষাক-আসাক আর টুকিটাকি জিনিস, আর কি, কয়েকটি বই - গোছাতে কতক্ষণই বা! বাক্স গুছিয়ে রেখে ঘরের বাইরে এলো সে, রিসেপশান এ এসে দাঁড়াল, জিজ্ঞাসা করল ত্রিবান্দম যাবার বাস কখন। চার্ট দেখ রিসেপশনিস্ট বলল প্রায় একঘন্টা পর একটা বাস আছে। হিসাব তৈরি করতে ও ব্রেকফাস্ট দিতে বলে সে ঘরে চলে এলো।

তারপর বাসস্ট্যান্ডে।

টিকিট।

বাস আসতে এখনও দেরি আছে। কি করা যায়? ওদিকে দোকান পসরা সারি সারি - সে পায়ে পায়ে এগোলো।

এতদিন কেটেছে বালিয়াড়ির ধারে ধারে, পাথরের ওপর, জলের ধারে কিংবা বিবেকানন্দ শিলায়, কিন্তু বাজারে কখনও ঢোকেনি। আজ বিচিত্র পসরার সম্ভার দেখতে দেখতে তার মনে হলো কিছু কেনার কথা। সামনের দোকানদার ডাকল - বাবু আসুন, কিছু নিয়ে যান। বিচিত্র উচ্চারণে বাংলা কথা, তবুও বাংলা। কতদিন পর বাংলা কথা শুনে তার এত ভাল লাগল! কি কিনবে?

কি কিনবে সে? হাজারো জিনিসের পসরা। শিশুর মতো সে নেড়েচেড়ে দেখছিল শামুক আর ঝিনুকের নানান পুতুল, মাদুরের ছবি, তালপাতার তৈরি বিচিত্র ধরনের ছোট বড় বাস্কেট আর কত রকমের যে মালা! দোকানদার তাকে একটি মালা দিলো। পাথরের কুচি দিয়ে তৈরি অদ্ভুত মালাটি দেখতে ভারি সুন্দর! অনেকক্ষণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল, কতক্ষণ আনমনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস বুকে চেপে মালাটি পকেটে রাখল।

বাস ছাড়তে এখনও আধঘন্টা বাকি। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল শেষবার সমুদ্রের দিকে। - কি বিচিত্র মানুষের মন - ভাবল - ফিরে যাওয়ার জন্য যেমন মনে আনন্দ তেমনই বিষন্ন দুঃখ এখান থেকে চলে যেতে। অথচ মাত্র তিনদিন আমি এখানে এসেছি, মাত্র তিনদিন, তবু টানে....

সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ সে দেখছিল একমনে। উত্তাল বাতাস তাকে বিপর্যস্ত করছিল, তবু সে দাঁড়িয়েছিল স্থির।

মিস্টার সান্যাল বলেছিলেন - নীলু, কয়েকটা দিন কন্যাকুমারীতে কাটিয়ে তবে কলকাতায় ফিরো। ট্রাঙ্ককলে মিস্টার সান্যালের সঙ্গে কতাবার্তা হচ্ছিল তার। মাদ্রাজে বসে সে যখন জানাচ্ছিল কাজ প্রায় শেষ, দুএক দিনের মধ্যেই কলকাতায় ফিরবে, তখন -

- তোমার ফাইল তাহলে রেডি? - উনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, - শিল্প মেলায় বিভিন্ন ফ্যাক্টরীর কি কি উল্লেখযোগ্য বিষয় দেখানো হবে সে সব তথ্য ঠিকঠাক সংগ্রহ করতে পেরেছ তো?

- হ্যাঁ, তবে বাছাই করতে হবে। সেটা আমি কলকাতায় ফিরেই করব, আপনারও মতামত নেওয়া দরকার।

- ঠিক আছে, তাই হবে, এখন তুমি যে কাজটা করবে তা হচ্ছে কয়েকদিনের জন্য সব কাজ বাক্সবন্দী করে ফেলবে। শুধু ঘোরা, বেড়ানো আর বিশ্রাম। এক মুহূর্তের জন্যও অফিস কিংবা কাজের কথা ভাববে না।

- তার কোনো প্রয়োজন হবে না - আমি মোটেই ক্লান্ত নই।

- কিন্তু আমি ঠিক করেছি তুমি কয়েকটা দিন কন্যাকুমারী তে কাটিয়ে তারপর

কলকাতায় ফিরবে। অতদূর গেছ, আর কন্যাকুমারী যাবে না?

সে অবাক - কেন বলুন তো?

- কেন? কেন? - যেন নিজের মনে বলেছিলেন মিস্টার সান্যাল - তুমি কি সুন্দরের পূজারী নও?

- হ্যাঁ - অস্ফুটে বলেছিল সে।

- এটা আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারবো না। আমি পৃথিবীর অনেক সুন্দর জায়গায় ঘুরেছি কিন্তু -

তিনদিন অন্তহীন বিশাল জলরাশি বেষ্টিত ছোট্ট এই ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে ফেরার বেলায় তার মনে হলো বিশাল এ প্রকৃতি এমনই সুন্দর কত লক্ষকোটি বৎসর, আমি এক ক্ষুদ্র সত্তা পৃথিবীতে আছি মাত্র কয়েকটি বছর। এ সমুদ্রের আয়ুর তুলনায় কয়েক মুহূর্তের সামিলও নয়! সেই মুহূর্ত জীবনের আরও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশ সময় আমি এখানে এলাম। এলাম, মুগ্ধ হলাম, নিজেকে হারালাম! এ এক আবিস্কার! নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে পুনরায় নতুন করে কুড়িয়ে নেওয়া। এবার ফিরে যাব, কোনো চিহ্নও থাকবেনা, কিংবা থাকবেনা কোনো প্রতিফলন সমুদ্রে বা আকাশে....

এসব ভাবতে গিয়ে বুকের গভীর থেকে উঠে এলো কি যেন দুঃখ। হাতের বাক্স নামিয়ে সে বসল ভিক্ষুক যেভাবে বসে পথপার্শ্বে তেমনই।গভীর নীল জলরাশির থেকে দৃষ্টি মুছে নিয়ে চোখ বুঝল সে। কিছুক্ষণ এভাবে, তারপর হঠাৎই উঠে দাঁড়িয়ে বাক্স তুলে নিয়ে দ্রুত ফিরে চলল বাসস্ট্যান্ডের দিকে।

চোদ্দ

আজ চব্বিশে ডিসেম্বর। আজ অফিসের স্পোর্টস। কলকাতা ময়দানের এক অংশে অফিসের স্পোর্টস অনুষ্ঠিত হয়।এবারেও সেই মতো আয়োজন হয়েছে। ডিসেম্বরের ঊজ্জ্বল রোদ্দুরে ঝলমল করছে লাল হলুদ ডোরাকাটা সামিয়ানা। সবুজ ঘাসের ওপর চুনের সমান্তরাল সব দাগ কাটা হয়েছে। মহিলা পুরুষ আর

ছোট ছোট সব ছেলেমেয়েরা সবাই খুব কথা বলাবলি করছিল, হাসছিল, খেলছিল, ছুটোছুটি করছিল। দুএকজন ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলছিল।

অনেকদিন পর চেনা পরিচিতদের সঙ্গে দেখা, এ ও সে সকলে তার দিকে এগিয়ে এসে কুশল বিনিময় করছিল। সেও বারবার এগিয়ে যাচ্ছিল এ ও তার দিকে, হাসছিল, কথা বলছিল, আর তার চোখ সারাক্ষণ কাউকে খুঁজছিল। গায়ে তার গাঢ় নীল রঙের ব্লেজার, সাদা শার্ট আর প্যান্ট। গত একমাসে মাথার চুল অনেকটা বেড়েছে, কাটা হয়নি। বড় বড় চুল তার কপালের ওপর ঝাঁপিয়ে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল বারবার। খুবই উজ্জ্বল তার মুখ। অজস্র হাসছিল সে। এতো হাসি সে আগে কখনও হাসেনি। তার মনে হলো - আমার কি হয়েছে? এতো হাসছি কেন?

ঠিক তখন তার দিকে একজন উজ্জ্বল চোখ মেলে এগিয়ে আসছিল। তার পরনে সবুজ রঙের শাড়ি জরির বড় বড় দুএকটা ফুল এখানে ওখানে। তার ফর্সা মুখে লালচে আভা। ঈষৎ সোনালী চুলগুলি উচ্ছল। সে এগিয়ে আসছিল ক্রমশ আরো আরো কাছে। অবাক দৃষ্টি মেলে সে অপলক তাকিয়ে - কে ও? কে? সে কথা ভুলে চুপচাপ তাকিয়ে।

কাছে এসেই মুখ নামিয়ে নিলো মার্সিয়া, তারপর চট করে একবার মুখ তুলে চোখে চোখ, পুণরায় জড়োসড়ো। গায়ের আঁচল টানল একবার তার স্বভাবগত নীচু গলায় বলল - আমি জানি আজ আপনি আসবেন - বড় বড় চোখে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো - ভাল আছেন?

এ এক আশ্চর্য স্বাস্থোজ্জ্বল মেয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে! সে এত অবাক! সবুজ ঘাসের ওপর, সবুজ শাড়ির ওপর, সোনালী ফুলের ওপর চোখ রাখল। ওর বঙ্কিম গ্রীবায় আর রক্তাভ গালে কি অপরূপ সৌন্দর্য!

- তুমি কেমন আছো?

- খুব ভাল।

- কেমন করে জানলে আমি আজ আসব?

- মিস্টার সান্যাল বলেছেন। আপনি যতবার ওনার সঙ্গে ট্রাঙ্ককলে কথাবার্তা বলেছেন ততবার উনি আমাকে জানিয়েছেন। পরশুদিন বললেন আপনি কালকে কলকাতা ফিরছেন আর আজ স্পোর্টসে যোগ দিচ্ছেন।

ওর চোখের ওপর চোখ রেখে সে উদাস গলায় বলল - গতকাল আমি এয়ারপোর্ট থেকে সোজা অফিস গিয়েছিলাম, দেখলাম তুমি অফিসে আসোনি।

- ও মা ! - সে যেন কি মূল্যবান জিনিস খুইয়েছে এভাবে বলল।

- আরও দেখলাম - তার কণ্ঠে ছেলেমানুষী ভঙ্গী - দেখলাম এই একমাসে যত অকাজ করেছ। তোমার ঘরে ঢুকে দেখলাম টাইপ মেশিনে ধুলো জমেছে, আর দেখলাম কতগুলি খাতা, খুবই বাজে বাংলা হাতের লেখা অভ্যাস করা, আর দেখলাম কতগুলি ছোটদের বাংলা বই, আর -

- উঃ, না - কি যেন বলতে গিয়ে মার্সিয়া চোরের মতো জড়োসড়ে।

- আমি কোম্পানীকে লিখব, তোমার এই মাসের মাইনে পাওয়া উচিত নয় - সে নকল গাম্ভীর্যে ভারি হলো – কি?

মার্সিয়া মুখ আর তোলে না।

সে খুব মিষ্টি করে হাসল, বলল - তুমি যে শুধু শাড়ি পরে এসেছ? গরমের পোষাক কিছু পরোনি কেন?

- পরেছি তো, উলের জামা - সরল বালিকার মতো সে আঁচল সরিয়ে জামা দেখাল।

....এ কি.... রহস্যময় গভীরতা নিয়ে আবৃত দূটি বিল্বফল.... তার বুকের মধ্যে ছলাৎ করে ওঠে রক্ত পায়ের পাতা থেকে মাথা পর্যন্ত বিভ্রান্ত স্নায়ু।

- আঃ, এ কি - তীব্র তিরষ্কারে ফুঁসিয়ে ওঠে সে।

মার্সিয়া অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে, ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল - কি?

- শাড়ি পরলে ওরকম করে জামা দেখায় না। তুমি কদিন শাড়ি পরছ?

মার্সিয়া গায়ে আঁচল জড়াল, বলল - বাড়িতে কদিন অভ্যাস করেছি, আজ পরে বাইরে বেরোলাম।

- পাগল! - ছোট্ট করে বলল সে, চারিদিক তাকিয়ে নিলো, না কারো দৃষ্টি

এদিকে নেই।

- আচ্ছা, আমি এখন আমার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তুমি তোমার ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াও।

- এখন কি কাজ?

- বাঃ, এখনই তো আমার কাজ। নানান খেলার ছবি তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। সভাপতির ভাষণ শুনে রাখতে হবে। প্রাইজ দেওয়ার সময় বিশেষ বিশেষ ব্যপার গুলো - সে সব অনেক কাজ, তোমাকে কি করে বোঝাবো।

- আমি আপনার কাজে কিছু সাহায্য করতে পারি?

- পারো - আচ্ছা না, তুমি যাও, এমন একটা সুন্দর আনন্দের দিনে তোমাকে আর কাজে নামাতে ইচ্ছে নেই।

- না, আমার উচিত আপনাকে -

- তুমি যাওতো - সে মৃদু ধমক দিলো।

মার্সিয়ার মুখ কাচুমাচু, দেখতে দেখতে হাসল সে, ছিড়ের দিকে এগিয়ে গেল। লাল হলদে ডোরাকাটা সামিয়ানার নীচে ক্যামেরা, স্তূপীকৃত নানা উপহার।

দুপুর পেরিয়ে পায়ে পায়ে বিকেল এগিয়ে এলো। উষ্ণ রোদ্দুরের আমেজ শেষ হয়ে আসছে। কয়েকটি বিক্ষিপ্ত বৃক্ষ দীর্ঘ ছায়া ফেলে ধ্যানমগ্ন। ছুটোছুটি, খেলাধুলা, প্রাইজ বিতরণ শেষ হয়ে গেছে। নরনারী, বালক বালিকা, শিশুরা একন ক্লান্ত। ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত দাঁড়িয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ মানুষজন গল্প করছিল। কেউ কেউ চুপচাপ বসে এলোমেলো চেয়ারে। কাগজের গ্লাসে কফি বিলি হচ্ছে, সেখানে একটি নাতিদীর্ঘ ' কিউ '। কেউ কেউ ফিরে যাচ্ছে সঙ্গীসাথীদের সাথে, বা ছেলেমেয়েদের হাত ধরে কথা বলতে বলতে। কেউ বা যাবার তোড়জোড়।

এক গ্লাস কফি নিয়ে সে ’ কিউ ‘ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে, একটা চেয়ারে বসবে ভাবতে ভাবতে এদিক ওদিক দেখছিল, চোখে পড়ল মার্সিয়া চুপচাপ বসে আছে দূরের দিকে কোথাও তাকিয়ে, মুখে তার শীতের বিষন্ন বিকেলের ম্লান ছায়া তুলি বুলিয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে সে ও কেমন বিষন্ন হয়ে যাচ্ছিল, মন্থর পায়ে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মার্সিয়া তাকাল। বসে থাকার জন্য অনেকখানি

মুখ তুলেতে হয়েছে ওকে।

- কফি নিয়েছ?

- না।

সে কফির গ্লাস ওর দিকে বাড়িয়ে ধরল - নাও।

মার্সিয়া ইতঃস্তত করলে সে বলল - আমি একবার খেয়েছি, তুমি নাও - মার্সিয়া হাত বাড়িয়ে নিল। এদিক ওদিক দেখল সে, একটা খালি চেয়ার নিয়ে এসে মুখোমুখি বসল। দেখছিল ওর বিষন্ন মুখ, ঈষৎ রুক্ষ এলোমেলো চুল, গলায় সবুজ পুঁতির মালা, কণ্ঠার হাড়ের ঈষৎ আভাস। সেখান চোখ রাখলে কি যেন তৃষ্ণা জেগে উঠল। অস্থিরতা সঞ্চারিত হলো বুকের মধ্যে, অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল।

- তুমি কি বাসে করে বাড়ি ফিরবে?

- হ্যাঁ।

- তাহলে এখান থেকে অনেকটা হেঁটে তবে সেই বাস রাস্তায় পৌঁছাতে হবে। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে, তুমি সঙ্গে আাসতে পারো। কোথায় তোমার বাড়ি?

- রিপন স্ট্রীট। - মার্সিয়া কফি শেয করে গ্লাসের কানায় আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে খেলা করছিল।

সে আনমনে দেখল ক্রীড়ারত আঙুলগুলি - কেমন ভরাট আর স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে ওর আঙুলগুলি! আবারও কেমন এক তৃষ্ণা - সে উঠল, বলল - চলো যাওয়া যাক। দুজনে সবুজ ঘাসে হেঁটে যায় মন্থর পায়ে....দীর্ঘ দুটি ছায়া পরস্পরকে ছুঁয়ে যেতে চায় বিকেলের রোদে... কোনো কথা নেই....

সারি সারি অনেকগুলি গাড়ি দাঁড়িয়ে, একটার কাছে এগিয়ে গেল সে, দরজা খুলে মার্সিয়াকে উঠতে দিলো, তারপর নিজে উঠল। ড্রাইভার দাঁড়িয়ে ছিল একটু দূরে, এগিয়ে এলো।

- রিপন স্ট্রীট্, ওখানে মেমসাবকে নামিয়ে দিয়ে আমাকে পৌঁছে দেবে - ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল।

একটু কাত হয়ে বসেছে সে, মার্সিয়াকে দেখার জন্য সারাক্ষণ মনে এক

আকুলতা! কি এক দুর্বার ইচ্ছা -

ঠান্ডা হাওয়া ঢুকছে ভেতরে, একটু ঝুঁকে ওপাশে হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে কাচ তুলে দিলো। কয়েকটি মুহূর্ত - মার্সিয়ার সামান্য কিছু স্পর্শ - বুক কেমন করে উঠল তার - তোমার ঠান্ডা লেগে যেতে পারে - কিছুটা কৈফিয়তের সুরে বলল সে। মার্সিয়া কথা বলল না।

- মার্সিয়া - সে ডাকল - তোমার মন খারাপ মনে হচ্ছে?

- না তো।

- আবার মিথ্যে কথা? বাঃ, আমি কোথায় তোমাকে আনন্দ করতে বললাম, আর তুমি আমার ওপর রাগ করলে, এই -

মার্সিয়ার কোলের ওপর এলিয়ে থাকা হাতে এক মুহূর্তের জন্য আলতো হাত ছোঁয়ালো সে। মার্সিয়া কি কেঁপে উঠল!

- রিপন স্ট্রীট এসে গেছি, এবার কোন দিকে? - ড্রাইভার বলল। দুজনে চমকে উঠল।

- ও-ই যে দূরে হলদে বাড়িটা - মার্সিয়া বলল। গাড়ি মন্থর গতিতে এগোলো।

- আগামীকাল আপনার জন্মদিন - হঠাৎ বলল মার্সিয়া।

সে চমকে তাকাল - ও, হ্যাঁ, তাইতো, কাল পঁচিশে ডিসেম্বর, কিন্তু তুমি কি করে জানলে?

মার্সিয়া উত্তর দিলনা, অন্য কথা বলল - আপনি খুব ভাল দিনে জন্মেছেন, আগামীকাল প্রভু যীশুর জন্মদিন।

- কাল তোমাদের উৎসব, ও, তাই চারিদিকে এতো আলোর সাজ।

- কাল নিশ্চয় আপনারও উৎসবের দিন? অনেক লোকজন আসবে বাড়িতে! আমাকে আসতে বললেন না তো?

- আমার খেয়ালই ছিল না কাল আমার জন্মদিন - সে উদাস গলায় বলল - ওটা খুব ছোটবেলার ব্যাপার তো! একটু আধটু মনে পড়ে, যখন স্কুলে পড়তাম, জন্মদিনে বাবা বইটই এনে দিতেন - সে ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে ম্লান হাসল, বলল - আগামীকাল অন্য যে কোনো সাধারণ দিনের মত প্রতিবারই চলে যায়,

এবছরও যাবে। কিন্তু তুমি কিকরে জানলে বলল না তো?

মার্সিয়া সোজা হয়ে বসল, বলল - আমি না জেনে একটা অন্যায় করে ফেলেছি, আপনার একটা ব্যক্তিগত চিঠি খুলে ফেলেছি। আমি বুঝতে পারিনি। একগাদা অফিসিয়াল চিঠি খুলতে খুলতে - তবে আমি পড়িনি, চিঠির সঙ্গে একটা গ্রিটিং কার্ড ছিল ওটাতেই শুধু চোখ পড়ল। টাটানগর থেকে আপনার ছোট বোন আপনাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছে। চিঠিটা আপনার টেবিলে রেখেছিলাম, গতকাল আপনি ওটা নেননি?

- নিয়েছি।

গাড়ি থেমেছে, মার্সিয়া আস্তে দরজা খুলল, ফিরে তাকাল, বলল - আসি।

পনের

.... বনে বনে সারারাত...নীল পাহাড়ের কোলে ঝরে যায় দুরন্ত ঝরনা... নেচে নেচে ছুটে চলে যায়.... সেখানে নির্জন ভূমে পাথরের বুকে শুয়ে বুকের কাছে জড়িয়ে নিয়ে আরেকটি উষ্ণ প্রাণ, তার আয়ত দৃষ্টি অপলক চেয়ে আছে

এভাবে আসঙ্গলিপ্সা তীব্রতর...সমস্ত শরীর জুড়ে আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে বিদ্যুতের মতো, তৃষিত ওষ্ঠপুট বারংবার ছুঁয়ে ছুঁয়ে তুলে নেয় অমৃত... তুমি কি আমার দেহে মিশে যেতে চাও? অথবা আমিই ডুবে যেতে চাই তোমার গভীরে!...

বনে বনে নীল উপত্যকায় এভাবে সে ঘুমে জাগরণে কল্পনা বিলাসিতায় শুয়ে থাকে সারারাত বুকের কাছে জড়িয়ে নিয়ে আরেকটি উষ্ণ প্রাণ।

সকালবেলা পূবের জানালা দিয়ে রোদ এসেছে, সে বেতের চেয়ারে বসেছিল। শালের ওপর রোদ্দুর অনেকক্ষণ থেকে উত্তাপ ছড়াচ্ছে, সে উত্তপ সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছিল শরীর জুড়ে। সে নিঃস্পন্দ বসেছিল। শালের ওপর একটা মাছি বসে বসে পা দিয়ে ডানা মাজছিল, পায়ে পায়ে ঘসাঘসি করছিল, মাথা ঘাড় মাজছিল, তারপর একটু সরে বসছিল, আবার পা দিয়ে ডানা মাজা – এসব অনেকক্ষণ থেকে দেখছিল সে, অথবা দেখছিল না, শুধুই আনমনে

তাকিয়েছিল।

সে যেন সম্মোহিত! সমস্ত শরীর জুড়ে কি যেন স্বাদ ছড়িয়ে আছে। সাররাত ধরে ঘুমে ও জাগরণে যে সকল কল্পনা বিলাসিতা তাকে জড়িয়েছিল এখনও তা যেন কাটছিল না। এখন চোখ বুজে অনুভব করতে চাইছিল।

- আমি বাজারে যাচ্ছি - সাধুদা। সে চমকে তাকাল, ঘাড় নাড়ল।

- বাইরের দরজাটা বন্ধ করতে হবে।

- যাচ্ছি, তুমি যাও।

একটু পরে সে উঠল, দরজা বন্ধ করল। ফিরতে গিয়ে হঠাৎ চোখ পড়ল টেবিলের ওপর রাখা এ্যাটাচি কেসটার দিকে, এগিয়ে গিয়ে ওটা খুলে একটা মুখ ছেঁড়া খাম বার করল, বাক্স বন্ধ করল।

ফিরে এসে পুণরায় চেয়ারে বসল সে, শালটা একটু আলগা করে গা এলিয়ে দিলো।

.... আজ পঁচিশে ডিসেম্বর....আজ আমার জন্মদিন। গতকাল আমাকে সেই মেয়েটি মনে করিয়ে দিয়েছে যে কিছুদিন আগে কোথায় ছিল আমি জানতামও না।.... সেই মেয়েটি যাকে আমি চালাকি করে চাকরিতে নিয়েছিলাম নিরাপদে থাকার জন্য। কি? আমি কি এড়িয়ে থাকতে চাইনি নারী?

.... নারী অর্থ নরম শরীর... শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে থরে থরে সাজানো লাস্য যেগুলি পুরুষ তুমি তোমার শরীর ও মনের মধ্যে ক্রিয়া করবে, বিশেষ এক অনুভূতি যার নাম কাম সেইসব অনুভবে ধীরে ধীরে দুর্বল তুমি নিজস্ব সত্ত্বা হারিয়ে তুমি নারীর কুক্ষিগত। এভাবে নারী তার হাস্য লাস্য কটাক্ষ ছলনা দিয়ে পুরুষকে টানে, শয্যাসঙ্গী করে, পূরণ করে নিজের চাহিদা....এভাবে পুরুষ নারীর দাসত্ব মেনে নেয়.... আমি কি চেয়েছিলাম? আমিতো এসব ছলনার জাল থেকে মুক্ত থাকতে একটা চালাকি করতে চেয়েছিলাম। তাহলে? আমি কি এখন নারীর কুক্ষিগত নই? আমি কি ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলিনি আমার সমস্ত সত্ত্বা?

একটি নারী দিনে দিনে কেমন অনায়াসে আমাকে গ্রাস করেছে, বিস্তার করেছে মোহজাল - না না, আমি কি ঠিক ভাবছি? আমি কি ওর ওপর অবিচার করছি না? ওকে ছোট করছি না? আসলে আমি নিজেই হারিয়ে গিয়েছি ওর মধ্যে....

সে ছটফট করে উঠল, উঠে দাঁড়াল, জানালার ধারে চলে গেল। জানালায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল সে, নীল আকাশ দেখল অনেকক্ষণ, একসময় নীচের দিকে চোখ নামাল। ডিসেম্বরের উজ্জ্বল রোদ্দুরে ডুবে আছে পথ ঘাট বাড়ি ঘর গাছগাছলি। সরোবরের জলে মাঝেমাঝে রোদ্দুর ঝিকমিক করে উঠছে।

.... আচ্ছা আমার মধ্যে একটা ক্ষুধা ছিল, একটা ক্ষুধিত শ্বাপদ বাস করত আমার মধ্যে, মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ দাঁত , আমার যন্ত্রণা, মনে হতো সব ছিঁড়ে খুঁড়ে - তখন আমি নিজকে ঘৃণা করতাম, নারীকে ঘৃণা করতাম.... আমার বাল্যকাল থেকে সেই শ্বাপদের সাথে বসবাস। অনেক চেষ্টায় আমি তাকে -

কিন্তু এখন এ এক নতুন অনুভব জন্ম নিচ্ছে আমার মধ্যে.... কি আশ্চর্য প্রশান্তি.... আনন্দগান বেজে ওঠে...বুকের ভিতর এক উষ্ণ প্রস্রবণ... সে প্রস্রবণ কার ছোঁয়ায় জন্ম নিলো?

.... কিন্তু আমি এ কি করছি? আমি কি তাকে নষ্ট করতে চাইছি না? কী ভীষণ তৃষ্ণা জেগেছিল কাল রাতে! কী ভীষণ কামনা! আমার সেই দুরন্ত কামনা তাকে ডুবিয়ে নিতে চায় আনন্দ লিপ্সায়। আমি প্রতারক। অবচেতন মনে আমার এ কি কলুষ লিপ্সা?

সে দুহাত মুঠো করল, যেন নিজেকে আঘাত করতে চাইল, আর দেখল মুঠোর মধ্যে দুমড়ে মুচড়ে গেছে চিঠি। দোমড়ানো চিঠি সোজা করল সে, খাম থেকে বার করে দেখল - একটা সুন্দর কার্ড, জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়ে তলায় লিখেছে ছোট বোন, আর একটা চিঠি, চিঠি খুলে দেখল তলায় লেখ বাবা ও মা।

চিঠি আর কার্ড নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিন্তু পড়ল না।

.... কেন তোমরা মাঝে মাঝে সাড়া দাও? কেন জানাও অস্তিত্ব? আমি চাইনা, কাউকে চাইনা, আমি একা থাকতে চাই, একা... চিঠিগুলি মুখের খুব কাছে নিয়ে এলো, বিড়বিড় করে বলল - আমি একা থাকতে চাই, একা... বলতে বলতে

চিঠিগুলি ঘরের মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দিলো, ঘর থেকে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল।

ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের মোড়ে এসে তাকে থমকে দাঁড়াতে হলো। এবার কোন দিকে যাবে সে? গতকাল গাড়ি এখান থেকে বাঁক নিয়েছিল। এখন তার খেয়াল হলো সে কোথায় যেতে চাইছে! বুঝতে পারা মাত্র সে নিজেকে ধমক দিলো আর ফিরে হাঁটতে শুরু করল।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে দ্রুত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে এসে ট্রামে উঠেছে, নেমেছে পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে, তারপর হাঁটতে হাঁটতে এসেছে ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের মোড়ে, তারপর কোন দিকে যাবে ঠিক করতে গিয়ে তার খেয়াল হয়েছে কোথায় যেতে চাইছে।

ছিঃ ছিঃ, মার্সিয়া কি ভাবত? এ আমার কি ব্যবহার? মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে হাঁটছিল সে, ক্লান্তি লাগছিল, তবু পার্ক স্ট্রীটের মোড় পেরিয়ে আরও এগিয়ে ময়দানের ভেতর চলে গেল। একসময় ময়দানের ভেতর গতকালের খেলাধুলার জায়গায় পৌঁছে গেল।

চুনের সমান্তরাল দাগ, ইতঃস্তত পড়ে কাগজের গ্লাসগুলি। সামিয়ানা খুলে নিয়ে গেছে, খুলে নিয়ে গেছে বাঁশের কাঠামো। কয়েকটি গর্ত শুধু হাঁ করে আছে। সমস্ত জায়গা জুড়ে এক বিষন্ন শূন্যতা। পায়ে পায়ে ঘুরতে ঘুরতে সে সেই জায়গাটা খুঁজে পেতে চেষ্টা করছিল যেখানে সে ও মার্সিয়া মুখোমুখি বসেছিল।

ষোল

.... কোন উৎসে ফিরে যাবে বলো? বলো কোন উৎসে ফিরে যাবো আমি? আলোর না আঁধারের? আমি কি পেয়েছি কোনো আলোর সন্ধান? না কি এ ও এক আঁধারের বিভ্রম? যেখানে দুঃখ সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেছে আরও কোনো গভীর আঁধারে? আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

সন্ধ্যাকালে সে বড়ো অস্থির। সেই সকালবেলা বেরিয়ে অনেক বেলায় ঘরে ফিরেছিল উদভ্রান্তের মতো। তার পর স্নান করেছে খেতে বসেছিল, কিন্তু খাওয়ায় রুচি ছিল না। এভাবে তার দিন পেরিয়ে যায়, এভাবে সন্ধ্যা নামে, আর এখন অন্ধকার আরও গাঢ়।

বাইরে সে স্থির। অচঞ্চল বসে আছে, যেন কোনো কাজ নেই তাই, অলস সময়ে, কিন্তু ভিতরে তার ঝড়। দ্বিধা দ্বন্দের ঝড়। কামনা বাসনার ঝড়। অন্ধকারে একা সে বসেছিল ঝড়ে বিধ্বস্ত পাখির মতন।

কলিংবেল বাজল। একটুখানি বেজেই থেমে গেল। যেন বোতামে কেউ হাত ছুঁইয়েই তুলে নিয়েছে। শ্রবন সচেতন হলো তার। একটু পর আবার। আবারও সেইরকম, তবে একটু যেন বেশি।

এসময় কে এলো? সোফা ছেড়ে উঠল সে,আলো জ্বালল। এতক্ষণ আঁধারে সবকিছু ডুবে ছিল, আলো জ্বালতেই সব ফিটফাট হয়ে উঠল, চারপাশে বইয়ের সারি, আসবাবপত্র। টেবিলের ওপর একটা বই খোলা ছিল, সেই যখন দিনের আলোয় এখানে এসে বসেছে তখন কিছু পড়তে চেষ্টা করেছিল বা বলা যায় মনকে অন্য দিকে সরাতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। তারপর কখন অন্ধকার নেমেছে, গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়েছে।

ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে গেল সে, দরজা খুলল, তখন উত্তরের হাওয়া খোলা দরজা দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘরে - একরাশ সুগন্ধ মাখামাখি। অবাক সে দেখল দরজায় দাঁড়িয়ে মার্সিয়া।

মুখ তুলে পূর্ণ চোখে তাকাল মার্সিয়া, অপরূপ হাসল। গায়ে তার টুকটুকে

লাল রঙের শাল, পরনে কালকের সেই জরির ফুল বসানো সবুজ শাড়ি, দুহাতে বুকের কাছে ধরে আছে একরাশ লাল টুকটুকে গোলাপ। সম্মোহিত সে দেখছিল আর দেখছিল!

- আমি কি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব? ভেতরে আসবো না? - অস্ফুট স্বরে বলল মার্সিয়া।

সে পায়ে পায়ে পিছিয়ে এলো, মার্সিয়া ভেতরে এসে দরজা ভেজিয়ে দিলো, তারপর পূর্ণ দৃষ্টি মেলে এগিয়ে এলো কাছে, খুব কাছে, ফুলগুলি দুহাতে তুলে ধরল।

.... কি যেন হয়ে যায়....চারপাশে সবকিছু মুছে যায়....চুপিসারে জেগে ওঠে গোলাপের বন.... দূর ঝরনার কলতান.... পাখিদের গান... চরাচরে আনন্দ নিঃস্বন...

সে দুহাতে মার্সিয়ার ফুল সমেত হাত ধরল, ফুলের ওপর মুখ নামিয়ে আকুল হয়ে গন্ধ নিলো, তারপর গভীর আগ্রহে ওকে বুকে টেনে নিলো।

- মার্সিয়া, মার্সিয়া - ব্যাকুল আগ্রহে বারবার ডাকল সে। মার্সিয়ার মুখ আর গোলাপের রাশি একাকার, সে তৃষিত ওষ্ঠ নামিয়ে আনল.... চারপাশে মর্মরিত বনভূমি... বসন্ত বাতাস...সময় দ্রবীভূত, স্নায়ুর গভীরে বৃষ্টি...

সহসা কি হলো, মার্সিয়াকে ঠেলে সরিয়ে দিল সে, দুহাতে মুখ ঢাকল, ফুঁপিয়ে উঠল - এ আমি কি করলাম, হায়, এ আমি কি করলাম - তার কন্ঠস্বরে গভীর বেদনা ঝরে পড়ল।

এলোমেলো ছড়িয়ে গেছে গোলাপেরা। মার্সিয়া দুহাত বাড়িয়ে ওর হাত ছুঁতে চাইল কিন্তু সে হাত সরিয়ে নিলো।

- মার্সিয়া তুমি যাও, তুমি যাও, আমার কাছ থেকে চলে যাও, আর কখনো আমার কাছে এসো না, কোন দিন না, কোনোও দিনও না।

মার্সিয়ার পা কাঁপচিল, ক্রমশঃ সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল তার, বুকের কাছে দুহাত করে শীতার্ত শিশুর মতো কাঁপছিল, তার চোখে জল, কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি বিন্দুর মতো অশ্রু গড়িয়ে পড়ল দুগাল বেয়ে, হতবাক সে অপলক তাকিয়েছিল।

- আমি আর সামনে আসবো না? - কোনক্রমে ভাঙা গলায় কথাগুলি বলল সে।
- না।
- কোনোদিন না?
- না।

কম্পিত পায়ে মার্সিয়া বেরিয়ে গেল, পায়ে পায়ে জড়িয়ে, দরজার চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে টলে গেল, তবু বাইরে পা দিলো।

প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে দরজা বন্ধ করল সে, তারপর সেখানেই বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে নিঃশব্দে কাঁদল অনেকক্ষণ।

তারপর কখন যেন অবাক সাধুচরণ তাকে ডেকেছে খেতে বলেছে, কিন্তু খেতে বসে কিছুই খেতে পারেনি, শুতে গেছে।

অতি দীর্ঘ নিদ্রাহীন রাত। সমস্ত রাত্রি জুড়ে মনে ঝড়ের দাপট। মরুঝড়। একা সে। বালির পাহাড়, বালুময় উপত্যকায় মুখ গুঁজে। ঝাপসা আঁধারে দূরে কে যেন চলে যাচ্ছে - মার্সিয়া যেও না, যেও না, যেও না - বুকের মধ্যে আকুল হাহাকার...

ভোরবেলা সাধুচরণ ভীষণ ভাবে ডাকাডাকি করছিল। একটু তন্দ্রাভাব আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, হঠাৎ এত জোরে ডাকাডাকি - ধনুকের ছেঁড়া ছিলার মতো আঘাত করল মাথার ভেতর, তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে উঠে বসল সে - কি হয়েছে?

- আমি দুধ আনতে যাবো বলে দরজা খুলেছি, খুলতে না খুলতে ধপ্ করে ভেতরে পড়ে গেলেন আপনার অফিসের সেই মেমসাহেব। দরজায় হেলান দিয়ে বসেছিলেন না কি? মনে হচ্ছে অজ্ঞান, কিরকম যেন পানসে হয়ে গেছেন।
- কি? কি? - চিৎকার করে উঠল সে, ছুটে গেল।

মেঝের ওপর পড়ে আছে মার্সিয়া, পা দুটি দরজার বাইরে।

সে বসে পড়ল - মার্সিয়া মার্সিয়া - আকুল গলায় ডাকল, কিন্তু মার্সিয়া সাড়া দিলনা। সে দেখল মার্সিয়ার মুখে নীল ছায়া। হাত ধরল, হাতের আঙুলগুলি সিটিয়ে যেন শক্ত হয়ে আছে। দিশাহারা সে ছটফট করে উঠল - কি

করি? আমি কি করি? - অসহায় ভাবে বলল সে।

- আপনাদের নার্সিংহোমে ফোন করুন না।

- কে ডাক্তার বাসু? আমি নিলাংশু মিত্র বলছি, আমার বাড়িতে একজন খুবই অসুস্থ, ঠান্ডায় অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

- সময় নষ্ট না করে যেভাবে হোক নিয়ে চলে আসুন।

- সাধুদা, ট্যাক্সি, হ্যাঁ, ওই লেকের ধারে দুএকটা গাড়ি এই সকালেও থাকে -

- কি করে নামাবে?

পারবো সাধুদা, আমি ওকে একাই তুলতে পারব।

তুমি দরজায় চাবি দাও।

- গায়ের শালটা তোমার -

আমার শীত করছে না সাধুদা, তুমি তোমার চাদর নিয়ে নাও।

- ডাক্তারবাবু, ওকে বাঁচিয়ে দিন, যে ভাবে হোক, যেমন করে হোক,ওকে বাঁচান। সারারাত পাগলিটা খোলা হাওয়ায় বসে কাটিয়েছে, আমি জানতেও পারিনি। ছেলেবেলায় ওর প্লুরিসি হয়েছিল, ও বড় সাবধানে থাকত ডাক্তারবাবু, কিন্ত কাল - হায় আমি এ কি করলাম।

সাধুদা, ওর বাবাকে একটা খবর দিতে হবে। কিন্তু আমি তাঁকে কি বলব?

সতেরো

তিনদিন কেটে গেছে সামুদ্রিক ঝড়ে দিগভ্রান্ত নাবিকের মতো। আজ সকাল থেকে তার মনে গভীর প্রশান্তি। ঝড়ের পরে আকাশ যেমন শান্ত হয়ে যায়! সারাদিন সে খুব শান্ত হয়ে কাজ করেছে। যদিও হিরন্ময় কিংবা অনন্ত সান্যাল মহাশয়ের হুল তাকে কিছুটা বিপর্যস্ত করেছিল তবু সেগুলি ঝেড়ে ফেলে সে কাজে ডুবে যেতে পেরেছে। খাওয়ার সময় তার অভ্যাস মতো সবশেষে

খেতে গিয়েছিল এবং গম্ভীর মুখে খেয়ে চলে এসেছিল।

এখন বিকাল। চা দিয়ে গেল বেয়ারা। সে কাজ সরিয়ে রাখল, চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল। ডান হাতে কাপ নিয়ে বাঁহাত উল্টে ঘড়ি দেখল – সাড়ে তিনটে, চঞ্চল হয়ে উঠল, এখন ওঠা দরকার, এখন আমি ওকে দেখতে যেতে চাই, কিন্তু -

চায়ের কাপ শেষ করে সে আভ্যন্তরীণ ফোন তুলল, তিনটে নম্বর ঘোরাল।
- হ্যাঁ, মিস্টার সান্যাল, আমি মিত্র বলছি, আপনি আমাকে পাঁচটার পর দেখা করতে বলেছিলেন, কিন্তু সেটা সম্ভব হচ্ছে না, আমি এখনই বেরিয়ে যাচ্ছি, নার্সিংহোম এ যাবো - বক্তব্য শেষ করে ফোন রেখে দিলো, বিপক্ষকে কিছু বলার সুযোগই দিল না।

ডক্টর, আজ কি আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে পারি?
- হ্যাঁ পারেন, তবে বেশি কথা না বলাই ভাল। সে দ্রত পায়ে দোতলায় উঠে এলো - ওইতো ঘর, পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়ালেই দেখা যাবে। কিন্তু দরজার কাছে গিয়ে আর পা সরে না। চুপচাপ কতক্ষণ যে দাঁড়িয়ে রইল! শুধু বুকের মধ্যে উত্তাল ঢেউ।
- কি ব্যাপার মিস্টার মিত্র? রোগীর সঙ্গে দেখা করেছেন? - প্রশ্ন শুনে ফিরে তাকাল - নার্স। সে হতাশ ভাবে ঘাড় নাড়ল, সরে এসে বারান্দার রেলিংএ ভর দিয়ে দাঁড়াল - না সিস্টার, আমি ঠিক -
- যান, ও ভাল আছে - পর্দা সরিয়ে দিলেন নার্স।

উমুক্ত দরজায় দাঁড়াল সে, মার্সিয়া মুখ ফিরিয়ে তাকাল, দ্রততর হলো তার বুকের স্পন্দন, ভেতরে এলো , মার্সিয়ার নিস্প্রভ চোখে চোখ রেখে বিছানার কাছে এগিয়ে গেল, বসল,মার্সিয়ার একটা হাত দুহাতের মধ্যে তুলে নিলো।
- মার্সিয়া, আমাকে তুমি ক্ষমা করো - মুখ নীচু করে বলল সে, মার্সিয়া তার আরেকটা হাত ওর হাতে তুলে দিলো, ওর ঠোঁট কাঁপছিল, চুপচাপ দুজনে

কতক্ষণ, নিরবতা কথা বলছিল।

দরজায় এসে দাঁড়ালেন মিস্টার অনন্ত সান্যাল, রুঢ় গলায় বললেন –

হেই, হাউ ডেয়ার ইউ আর? আই টোল্ড ইউ টু মিট উইথ মি আফটার ফাইভ, হাউ ক্যান ইউ ইগনোর মি? মার্সিয়ার দিকে তাকালেন - হোয়াটস রং উইথ হার? কি হয়েছে ওর?

সে উঠে দাঁড়াল, ওনার সামনে মাথা নীচু করে দাঁড়াল, বলল - পঁচিশে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ও ফুল নিয়ে আমাকে জন্মদিনের শুভেচছা জানাতে এসেছিল, আমি ওকে তাড়িয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম, বলেছিলাম আর কোনো দিন আমার সামনে আসবে না। সেই আঘাত ও সহ্য করতে পারেনি, দুঃখে কাতর হয়ে দরজার বাইরে ওই ঠান্ডার মধ্যে চুপচাপ বসে বসে কেঁদেছে , আর ঠান্ডা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে নিতে অজ্ঞান হয়ে গেছে। সকালে সাধুদা দরজা খুলে - বলতে বলতে কেঁদে ফেলল সে, দুহাতে অনন্ত সান্যালের দুই হাত তুলে নিয়ে সেই হাত দিয়ে নিজের গালে চড় মারতে লাগল আর বলতে লাগল - আপনি আমাকে মারুন মারুন, আমি একটা পশু, আমি আপনার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করি, আমার বাবার সঙ্গে, মায়ের সঙ্গে, বোনের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করি, শেষে ওর সঙ্গে - আঃ, আপনি আমাকে যা ইচ্ছা শাস্তি দিন, আমাকে মারুন, মারুন -

মার্সিয়া উঠে বসতে চায়, হাত নেড়ে শুধু বলে - না, না, না -

- হেই, হেই, স্টপ ইট, স্টপ ইট, - দুহাত ছাড়িয়ে নিয়ে ওর দুকাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দেন, বলেন - একটু শান্ত হও, নীলু, একটু শান্ত হও, দেখো দেখো ও কিরকম কষ্ট পাচ্ছে -

মার্সিয়ার দিকে তাকায় সে, আর শান্ত হয়ে যায়।

- হেই, লেডি অফ্ ফেথ্, ডোন্ট বি একসাইটেড, তুমি শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো - বলতে বলতে বিছানার কাছে এগিয়ে যান, বলেন - আই নো, ইউ লাভ্ হিম সো-ও মাচ্ - নিজের দুই হাত দুপাশে বিস্তার করে দেখান, বলেন - আই নো ইউ হ্যাভ চেঞ্জড্ মাই বয় উইথ ইয়োর লাভ এন্ড ফেথ্ - মার্সিয়ার মাথায়

আলতো করে হাত বুলিয়ে দেন, বলেন - গড্ ব্লেশ ইউ মাই চাইল্ড, গড ব্লেশ ইউ!

দাপুটে ডাইরেকটরের দাপাদাপিতে সচকিত হয়ে ততক্ষণে চলে এসেছেন ডাক্তার ও নার্সেরা, দেখতে দেখতে সকলের মুখে হাসি চোখ সজল।

শুভম্